ষয়ে কৃত-নিশ্চয় হইয়া তন্নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া আছেন, মৃত্যুই তাঁহাদিগের পক্ষে জন্ম ও প্রকৃত জীবন বলিয়া বিবেচনা করিতেন*। সাংসারিক শুভ ও অশুভ এই দুইটিতে তাঁহারা নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। যদিও তাঁহারা ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে শুভ ও অশুভ এই উভয়ের ভেদ স্বীকার করিতেন এবং যদিও তাঁহাদিগের বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্র-সকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম নিয়মের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন †; তথাচ তাঁহারা কহিতেন যে এই জীবনে যাহা কিছু উপস্থিত হইতেছে, তন্মধ্যে কোনটিকে শুভ ও কোনটিকে অশুভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না ‡। তাঁহারা মনুষ্যের সুখ দুঃখের ভাব অপনীত করিবার নিমিত্তই এই মত সবিশেষ পোষণ এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সুখে অনাসক্তিকেই মনুষ্যের বিষয়-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া উদ্ঘোষণ করিতেন।

ঐ মহাত্মা আরও কহিয়াছেন যে, হিন্দুরা স্ত্রীলোকদিগকে আত্ম-জ্ঞানের বিষয় কদাচই উপদেশ দিতেন না। তাঁহারা এই রূপ বিবেচনা করিতেন, যদি স্ত্রীলোকেরা আত্ম-জ্ঞান শিক্ষা করিয়া সুখ দুঃখে একান্ত ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবন ও মৃত্যুকে একই রূপ পদার্থ বিবেচনা করে, তাহা হইলে তাহারা অন্যের চির-কিঙ্করীর ন্যায় আর অবস্থান করিবে না এবং যদি তাহারা আত্ম-জ্ঞানের যাথার্থ্য অনুধাবনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে স্বভাব-সুলভ চপলতা বশত অনধিকারীর নিকট সেই অযথার্থ কথা-সকল অনায়াসেই প্রকাশ করিবে। এই ইতিবৃত্তবিৎ যাহা কহিয়াছেন, তাহা হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রমাণ-সঙ্গত। আমরা সূত্র ও গৃহসূত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে স্ত্রীলোকের বেদে কিছুমাত্র অধিকার নাই। গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরই বেদে অধিকার লাভ করা সম্পূর্ণ আবশ্যক। এমন কি, বেদের উপরই ব্রাহ্মণদিগের সমুদায় শিক্ষা নির্ভর করে; এই নিমিত্ত তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু-গৃহে গুরুর দুঃসহ শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিতেন। যাহাই হউক, যদিও স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই; তথাচ আমরা বেদ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, স্বামী আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া যাগযজ্ঞাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, এই রূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে*। ব্রাহ্মণ-ভাগে

---

* ধর্ম্মযাজক বটলার কহেন যে বর্ত্তমান জীবন ও মৃত্যুর বিষয় জ্ঞাত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মৃত্যু জন্মের ন্যায় ক্রমশ আমাদিগকে জীবনের উন্নত অবস্থায় উপনীত করিয়া থাকে।

† ঋগ্বেদে বরুণের স্তুতিবাদে একস্থলে কীর্ত্তিত হইয়াছে 'বিমচ্ছ্রথায় রশনামিবাগ ঋধ্যম তে বরুণ খামৃতস্য। মা তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা শার্য্যপসঃ পুর ঋতোঃ। ২৪সূ ৫ঋ। হে বরুণ! গলদেশ হইতে রজ্জুর ন্যায় বিধি-বিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান-জনিত পাপ-ভার আমা হইতে অপনীত কর। তুমি আমাকে তোমার সৎপথে গমন করিতে দেও। আমি কর্ম্মক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব, তৎসমুদায় যেন উচ্ছিন্ন না হয় এবং কর্ম্ম সমাপ্তির পূর্ব্বে কর্ম্মের যেন কোন অঙ্গ-বৈকল্য না জন্মে। 'অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রাড়্ তাবোঽনু মা গৃভায়। দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্ধ্যংহো ন হি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে'। ৬ ঋ। হে বরুণ! আমার অন্তর হইতে ভয় সমুদায় বিদূরিত করিয়া দেও। হে সম্রাট! গোবৎসের গলদেশ হইতে যেমন রজ্জু উন্মোচন করে, সেই রূপ আমাকে পাপ মুক্ত করিয়া দেও। আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। তোমাহইতে পরিচ্যুত হইলে আমি আপনার নিমেষ-পাতেও সমর্থ হই না। 'ধৃতব্রতা আদিত্যা ইষিরা আরে মৎকর্ত্ত রহসূরি বাগঃ। সূ ২৯। ১ ঋ। হে বিশ্বেদেবগণ! তোমরা সকলের প্রার্থনীয়। এক্ষণে আমাদিগকে পাপ সমুদায় হইতে উন্মুক্ত কর।

‡ "সাংসারিক সুখ দুঃখ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম শুভাশুভের পরিমাপক নহে, ইহা এই ক্ষণে ইউরোপের ধর্ম্ম-নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য যে এই সিদ্ধান্ত কত পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল।" সম্পাদক।

* বেদে উক্ত হইয়াছে 'বিশ্বা তত ত্রে মিথুনা অবস্যবঃ, হে ইন্দ্র! যজমানগণ সহধর্ম্মিণীর সহিত তোমার উদ্দেশে

পতি-পত্নীর একত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি বিহিত হইয়াছে। সূত্রেও এই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যজ্ঞকালে স্বয়ং স্বামী যজ্ঞের উপযোগী মন্ত্র সকল সহধর্ম্মিণীকে পাঠ করাইবেন; অথবা পুরোহিতও যজমানের পত্নীকে বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করাইতে পারেন। যদিও যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে স্ত্রীলোকের মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে; তথাচ তাহারদিগের আত্ম-জ্ঞানে কিছু মাত্র অধিকার নাই। কিন্তু মৈত্রেয়ী প্রভৃতি কয়েকটি ব্রহ্মবাদিনীদিগের পক্ষে এই নিয়মের বিপ্রতিপত্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মহাত্মা ম্যাগ্যাস্থিনিস্ হিন্দুদিগের বিষয়-বৈরাগ্য ও শান্ত প্রকৃতির বিষয় যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বতন শাস্ত্র সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া অবিকল সেইরূপই দেখিতে পাই। এই সমস্ত শাস্ত্র এই বিজ্ঞান-নিপুণ জাতির পার্থিব চরিত্র কিছু মাত্র অভিব্যক্ত করিতেছে না। সাংসারিক উন্নতি-সম্পাদনে আসক্ত হইলে ইতিবৃত্তে যেমন তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, হিন্দুদিগের কোন শাস্ত্রে তাহার কিছুই চিহ্ন নাই।

এই রূপ বিষয়-বিরক্ত ব্যক্তিরা যে পার্থিব চরিত্র প্রদর্শন করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ইহাঁরদিগের অত্যুৎকৃষ্ট মানসিক ভাব ইহাঁরদিগকে পার্থিব চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে দেয় নাই। কিন্তু এই বলিয়া এই জাতি কোন অংশেই আমারদিগের অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। স্বদেশানুরাগ যাহাদিগকে উন্মত্ত-প্রায় করিয়াছিল, রোম ও গ্রিক ইতিহাস পাঠ করিয়া যদি সেই সকল ব্যক্তিকে প্রশংসা করিতে হয়, তাহা হইলে যাঁহারা বিশুদ্ধ ও উন্নত জীবনের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত স্থাপন করিয়া কখন কখন নিরর্থক ত্যাগ স্বীকার করিয়া ছিলেন, তাঁহারদিগকে ঘৃণা করিতে আমারদিগের কিছুতেই অধিকার নাই। এই হিন্দুজাতীয়েরা এক সময়ে গ্রিশিয়দিগের নিকট যেমন গৌরব লাভ করিয়া ছিলেন, অন্য কোন জাতিই তদ্বিষয়ে সমর্থ হন নাই। মহাবীর আলেকজান্দরের শাসন-কালে হিন্দুদিগের সাংসারিক নীতি ও বুদ্ধি-বৃত্তি-গত অবস্থা আলোচনা করিলে যদিও কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ দৃষ্ট হয়না, কিন্তু তাহা উহাঁদের স্বাভাবিক অভাব বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। উহাঁরা যাহারদিগের শারীরিক বল বীর্য্যে বশীভূত হইয়াও যাহারদিগকে ম্লেচ্ছজাতি বোধে যথোচিত ঘৃণা করিতেন, সেই সমস্ত ভিন্ন দেশীয় বিজেতৃ জাতিদিগের নিরন্তর পীড়ন বশতই তৎসমুদায় উন্মেশিত হইতে পারে নাই। আমরা কল্যাণ নামক এক ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই ইহা এক প্রকার সুস্পষ্ট অবগত হইতে পারি। যখন মহাবীর আলেকজান্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ছিলেন, সেই সময়ে তিনি কল্যাণকে প্রলোভন দেখাইয়া আপনার অনুসরণ করাইবার চেষ্টা পান। কল্যাণও প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবার নিমিত্ত আপনার বিশুদ্ধ আবাস ভুমি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তৎকালে কল্যাণের এই রূপ বিসদৃশ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে নীচাশয় ও দুরাকাঙ্ক্ষ বলিয়া তাঁহার এই ব্যবহারে যথোচিত দোষারোপ করিয়াছিলেন। আলেকজান্দর মন্দনীচ নামক আর এক ব্যক্তিকেও এই বিষয়ে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ তেজস্বী পুরুষ তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই;

যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ভাগে উক্ত হইয়াছে 'জায়াপতী অগ্নি মাদধীয়ীতাং'। সূত্রে উক্ত হইয়াছে বেদং পত্নৈ প্রদায় বাচয়েৎ। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে 'নাস্তি-স্ত্রীনাং পৃথক যজ্ঞং' এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র কোন যজ্ঞানুষ্ঠানেই অধিকার নির্দ্দিষ্ট নাই।

প্রত্যুত তিনি আলেকজান্দরের দূতের মুখে এই রূপ অধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক যে প্রকার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যে তিনি কেবল আপনার জাতি মধ্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাহা নহে; স্বয়ং আলেকজান্দারও তাঁহার ভুয়সী প্রসংশা করিয়াছিলেন। পরিশেষে যখন কল্যাণ বুঝিলেন যে এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে, তখন তিনি অনুতাপানলে যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই পাপের শান্তি বিধান করিবার নিমিত্ত পসর্গদ দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আপনার জীবন আহুতি প্রদান করেন। পূর্ব্বকালে এইরূপ অবিকল আর একটি ঘটনা হইয়াছিল। এই ভারতবর্ষের বারিগজ দেশ হইতে একটি ব্রাহ্মণ ইউরোপে গমন করিয়া আথেন নগরে গ্রিশিয়দিগের সমক্ষে অনলপ্রবেশ করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে গ্রিশিয়রা সকলেই চমৎকৃত হন এবং তাঁহার স্মরণার্থ এক সমাধিস্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এই রূপ লিখিয়া দেন "এইস্থানে একজন ভারতবর্ষীয় আচার্য্য দেহ বিষর্জ্জন করিয়াছেন; ইনি হিন্দুদিগের প্রাচীন প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া অমরত্ব লাভের চেষ্টা করেন"।

জাতি-সাধারণ-স্বাধীনতা থাকাতেই গ্রিশিয়দিগের প্রতিভা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সত্য বা মিথ্যা উপাখ্যানে পূর্ণই হউক, মহাকবি হোমরের কবিতা-সকল বীর-মদ-মত্ত গ্রিশিয়দিগের উদ্দেশেই প্রস্তুত হয়। যদি পারসীকেরা গ্রিশিয়দিগের বল পৌরুষ সমুদায় অপহরণ করিয়া লইত, তাহা হইলে আমরা এক্ষণে হিরোডোটস্, ইকিলস্, সোফোক্লেস্, ফিডিয়াস্ ও পেরিক্লেসের নামও শুনিতে পাইতাম না। যেখানে স্বদেশাভিমানের ভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তথাকার লোকেরা কবিদিগের কাব্য আগ্রহাতিশয়-সহকারে শ্রবণ করে বলিয়াই কবিগণ গর্ব্বিত হইয়া থাকেন এবং তত্রত্য লোকেরা ঐ সমস্ত কাব্যে বর্ণিত হয় বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন দেশ-সাধারণ-অবনতির অবস্থা সমুপস্থিত হয়, তখন বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকদিগের প্রতিভা সাংসারিক উন্নতির ইচ্ছা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার আলোচনায় শান্তি-লাভের বাসনা করিয়া থাকে। যখন গ্রিশিয়েরা ক্রমশ হীন-বীর্য্য হইতে লাগিলেন, সেই সময়েই সক্রেটিস্, প্লেটো, আরিষ্টটল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমত মাসিডোনিয়ার শাসন, তৎপরে রোমকদিগের উৎপীড়ন; এই দুই কারণে গ্রিশিয়েরা অতিশয় মসৃণ ভাব ধারণ করে; কিন্তু তৎকালে তাহারদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি যে সমস্ত অবিনশ্বর ভাব প্রসব করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি স্বাধীন ও পরাধীন এই উভয় বিধ জাতির মনো মধ্যেই জীবিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা স্বদেশাভিমানের ভাব কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না এবং জাতি-গত প্রশংসার প্রত্যাশাও তাঁহারদিগের হৃদয়কে স্ফীত করিতে পারিত না। ভারতবর্ষে এমন বীরই ছিলেন না, যিনি কবিগণকে উৎসাহিত করেন এবং এমন ইতিহাসও ছিল না, যাহা একজন ইতিবৃত্ত-লেখককে উত্তেজিত করিতে পারে*। যে রঙ্গ ভূমিতে ভারতবর্ষীয়দিগের মনোবৃত্তি স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করিয়া-

* হিন্দুজাতি দিগের বীর ও ইতিহাসের অভাব নাই। গ্রন্থকার যেমন হোমরকে নিদর্শন স্থলে আনিলেন হিন্দুদিগের রামায়ণ ও মহাভারত তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। রামায়ণ ও মহাভারতে যেরূপ বীরগণের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত বিস্ময় কর সন্দেহ নাই।

ছিল, তাহার নাম ধর্ম্ম ও পদার্থবিদ্যা। ভারতবর্ষীয়দিগের মনে যেমন ধর্ম্ম ও মনোবিজ্ঞানের ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল, এমন আর কোন জাতিরই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতবর্ষীয়েরা অতিশয় তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। তর্কের যুদ্ধই তাঁহাদের যুদ্ধ ছিল। তাঁহারা অতীত কাল চিন্তা করিতে গিয়া কি রূপে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেন। ভবিষ্যৎকাল চিন্তা করিতে গিয়া সৃষ্টির স্থায়িত্ব কি রূপে হইবে,তাহারই চিন্তা করিতেন। কিন্তু এই অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রশ্নের জীবন্ত সিদ্ধান্ত-স্থল বর্ত্তমান কাল তাঁহারদিগের চিন্তাশক্তি, উদ্যোগ ও উৎসাহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আমরা যখন ইতিবৃত্ত মধ্যে হিন্দুদিগের সমুদায় মনোবৃত্তির গতি পর্য্যালোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে এই জাতির আধ্যাত্মিক জীবন যেমন উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতি কার্য্যক্ষম বৃত্তি সমুদায় উন্মূলিত এবং যে সকল গুণ প্রভাবে পৃথিবীর ইতিবৃত্ত-মধ্যে স্থান লাভ করা যাইতে পারে তাহা যেমন বিলুপ্ত করিয়াছে, এমন আর কোন জাতিই নাই।

ইজিপটিয়, গ্রিশিয়, রোমক, পারসীক, ইহুদী, বাবিলোনিয়, আসিরিয় ও টিউটন জাতীয়েরা এক এক সময়ে রাজনীতি বিদ্যার যার পর নাই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াগিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা এই সুমহৎ বিষয়ে এত অল্প সংযোগ রাখিয়াছিলেন যে তাহা লোকের গণনার মধ্যেই আইসে না। বিদেশীয়েরা যে তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিবে ইহা এক জন হিন্দু নৃপতির মনে স্বপ্নেও উদয় হইত না এবং তাঁহারদিগের জিগীষা বৃত্তিও কদাচ ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিত না।

নূতন পুস্তক।

সঙ্গীত।

শ্রীযুক্ত আর্থর হুইটেন কলিকাতা নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে পূর্ব্বতন লোকদিগের সংগীত সংক্রান্ত যে একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছেন, আমরা তাহার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। এই প্রস্তাবে যদিও কোন কোন দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে; তথাচ এক জন ইউরোপীয় হইয়া এতদ্দেশীয় সংগীত বিদ্যার যে এতদূর অনুসন্ধান রাখিয়াছেন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসার বিষয়। তিনি এই প্রস্তাব প্রস্তুত করিতে যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তদনুরূপ ফল-লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি এতদ্দেশীয় সঙ্গীত বিদ্যার এত আলোচনা করিয়াও মধ্যে মধ্যে এ রূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে তাহা দেখিলে তাঁহার তাহাতে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, এই রূপ বোধ হইয়া থাকে। তিনি একস্থলে হিন্দুদিগের গীতের তাল অনিয়মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে আমারদের দেশে মৃদঙ্গ প্রভৃতি যে সকল তাল-নিরূপক যন্ত্র এখনও প্রচলিত আছে, তাহারদিগকে নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়; কেন না যদি তালের কোন নিয়ম না থাকে, তবে তালনিরূপক যন্ত্রে আর প্রয়োজন কি? গ্রন্থকার যদি অস্মদ্দেশীয় তালের নিয়ম জানিতে যথার্থই ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি অতি সহজ উপায়ে তাহা জানিতে পারেন। সে উপায় এই যে তিনি এক জন বাদ্যকরকে আপনার সমীপে আনয়ন করুন, সে বাদ্য করিবে ও আর এক জন তালজ্ঞ ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে তাল দিবে; ও যদি আবশ্যক বোধ হয়, তবে এক জন গায়ককে আনাইয়া তালের সহিত যে গীতের কতদূর যোগ তাহা তিনি অনায়াসেই অবধারণ করিতে পারেন। এই সহজ উপায় অবলম্বন করিলে বোধ হইতেছে, এই বিষয়ে উঁহার সংশয় এক-কালে তিরোহিত হইবে। আর একস্থলে তিনি ইজিপ্টিয়দিগকে প্রাচীনতা বিষয়ে সর্ব্ব প্রধান বলিয়াছেন। ইহা নিতান্ত

যুক্তি-বিরুদ্ধ। হিন্দু ও পারসীকেরা ইজিপটিয়দিগের অপেক্ষা প্রাচীনতা বিষয়ে কিছুতেই ন্যূন নহে। তিনি মধ্যে মধ্যে বাইবলের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত নিরর্থক ও অপ্রীতিকর বলিয়া উপেক্ষিত হইল। তিনি যে কয়েকটি যন্ত্রের প্রতিরূপ দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা পূর্ব্ব কালে ও এক্ষণে আরও কতক গুলি যন্ত্র দৃষ্ট হয়। যদিও তৎসমুদায়ের প্রতিরূপ প্রকাশ করা অনাবশ্যক, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে তাহার উল্লেখ করাও উচিত ছিল। শঙ্খ আমাদিগের সঙ্গীতের উপযোগি যন্ত্র নহে, উহা পূর্ব্বে যুদ্ধ-স্থলে এবং এক্ষণে মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদ্ধৃত।

ব্রহ্মসাধন।

ব্রহ্মসাধনের ষষ্ঠ সোপান।—ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার অভ্যাস।

আত্মা নির্ম্মল হইলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভের উপযুক্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন একেবারে সম্পন্ন হয় না। তজ্জন্য অভ্যাস আবশ্যক। সম্মুখস্থ বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে প্রতীতি করা ক্রমে অভ্যাস করিতে হইবে। তিনি সকল স্থানে আছেন ও সকল ঘটনা বিধান করিতেছেন এ প্রকার সর্ব্বদা উপলব্ধি করিবে। হৃদয়ধামে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে। তাঁহার সকল কার্য্যে তাঁহার হস্ত দর্শন করিবে। সাধারণ ও অদ্ভুত ঘটনা হইতে ক্রমে বিশেষ বিশেষ সামান্য ঘটনা সকলেতেও ঈশ্বরের হস্ত দেখিবে। এইরূপে সকল সময়ে ও সর্ব্বত্রে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।

ব্রহ্মসাধনের সপ্তম সোপান—ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন।

প্রেমময় মঙ্গলময় পরম পিতা সম্মুখে বর্ত্তমান, সাধক ইহা দেখিলেই তাঁহার অনুপম মাধুর্য্যে বিগলিত হয়েন। তখন তিনি সমুদায় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়েন।

অনেক ব্যক্তি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতি করিয়াই তৃপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সাধকেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে চান। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিলে তাঁহাদের আর সকলি বৃথা বোধ হয়। তাঁহারা ঈশ্বর প্রাপ্তি বিনা আপনার জীবন পর্য্যন্ত ভার বোধ করেন। তাঁহারা স্বার্থভাবকে একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলেন, তাঁহারা আপনার বলিয়া আর কিছুই রাখেন না, সকলই ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির বশে তাঁহারা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সকল প্রাণ পণে সাধন করেন কিন্তু তাহাতে স্বার্থ ভাব আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা অতিশয় কষ্ট অনুভব করেন। তাঁহারা নিঃস্বার্থ হইয়া আপনার সমুদায় আত্মাকে কেবল ঈশ্বরের কার্য্যে নিয়োজিত করেন। এই রূপে স্বার্থভাব শূন্য হইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের একান্ত সহচর ও অনুচর হয়েন। তাঁহারা আপনাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া আপনার আত্মাকে ঈশ্বরের সত্তাতে সর্ব্বতোভাবে বিলীন করেন।

ইহাই সাধনের শেষ কার্য্য। যখন সাধক ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন এবং স্বার্থভাবের সহিত সমুদায় পাপ পরিত্যাগ করিয়া আপনার নির্ম্মল সংযত আত্মা ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তখন তিনি তাঁহার পথের পথিক হয়েন, অর্থাৎ তাঁহার একান্ত সহচর ও অনুচর হয়েন। তিনি যাহা করেন, সেই পরব্রহ্মের উদ্দেশে করেন। তিনি স্বার্থ ভাব পরিত্যাগ করিয়া যে যে কর্ম্ম করেন, তাহা ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ যদযৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" এ অবস্থাতে সাধক ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া অঙ্গীকার করেন যে "হে হৃদয়-নাথ! অদ্যাবধি আমি তোমার একান্ত দাস হইলাম। হে হৃদয়স্থিত পুণ্যপাপেক্ষিতা পুরুষ! তুমি যে দিকে আমাকে যাইতে বলিবে সেই দিকে যাইব, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোন কর্ম্ম করিব না।" এবং

সেই অঙ্গীকার পালন করেন। এ অবস্থাতে ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ আত্মা অনুভব করিতে পারে এবং বিলক্ষণ করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। তখন আত্মা বুঝিতে পারে যে ঈশ্বর তাহার ঈশ্বর—তাহার হৃদয়েশ্বর। আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের যেমন সম্বন্ধ, এমন কোন বস্তুর সঙ্গে নহে। আত্মাকে যেমন তিনি গাঢ়-রূপে আলিঙ্গন করিয়া আছেন; শোভন বাহ্য জগৎকে তিনি তেমন গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া নাই। এ অবস্থাতে তিনি বিলক্ষণ অনুভব করেন যে পরমাত্মা প্রাণের প্রাণ। এ অবস্থাতে তাঁহার পক্ষে ইহা বলা স্পর্দ্ধার বিষয় নহে যে ঈশ্বর আ-মার সখা—ঈশ্বর আমারই। এ অবস্থাতে অন্তরের আনন্দ ঈশ্বরের মহিমা গাঢ়রূপে পরিস্ফুটিত হয়; সকল বস্তু সুশোভন দেখায়, কষ্ট সহজ বোধ হয়, দুঃখ ক্লেশ সকল উপানৎ লিপ্ত ধূলির ন্যায় প্রতীয়মান হয়, শ্রেয়কে প্রেয় বোধ হয়, লোকের অবজ্ঞাতে দুঃখ বোধ হয় না, শাকান্ন আহার করিতে পাইলেও তাহার প্রত্যেক গ্রাস সুমিষ্ট জ্ঞান হয়। কি সুখ কি দুঃখ, কি সুস্থতা কি সুস্থতা, কি পীড়া, সকল বস্তু ঈশ্বরের; অতএব তিনি দুঃখেতেও অনুদ্বিগ্নমনা থাকেন, ও সুখে-তেও বিগতস্পৃহ হয়েন। তাঁহার আত্মার সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সকল বস্তু তাঁহার সম্বন্ধে নূতন হয়। তখন তিনি বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন এবং বসন্তকালে পুষ্প কাননে যেমন শিশু ক্রীড়া করে, তিনি সেইরূপ এই জগতে আনন্দ করেন। বাস্তবিক তিনি আপনাকে সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় জ্ঞান করেন। তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, এমন তিনি বিলক্ষণ রূপে অনুভ করেন। তাহা ভৌতিক জন্ম নহে, তাহা আধ্যাত্মিক জন্ম। যিনি এইরূপে আ-ধ্যাত্মিক জন্ম লাভ করেন, তিনিই প্রকৃত দ্বিজ শব্দের বাচ্য।

শ্লোকঃ।

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামাযং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
সশান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

MISSION OF THE APOSTLES.

"The Cross was the banner under which mad men assemble to glut the earth with blood."

DISSATISFIED with his expedition to Nazareth, Jesus went to Upper Galilee, which had already been the theatre of his wonders. He found the inhabitants of that country in a disposition better adapted to his purpose. He perceived, however, that the necessity they were under of suspending their labour in order to come and hear him, kept a great number at home. This consideration obliged him to disperse his apostles by two and two in the province. It is probable, he resolved on this dispersion, because he found his own sermons and prodigies did not gain proselytes enough. The continual enterprises of his enemies made him feel the necessity of increasing his party.

It appears that Jesus had already sent several of his disciples on mission, retaining near himself his twelve apostles only; it may, however, be presumed that these preachers were as yet mere novices; their labours were unsuccessful; for they found the devils so obstinate as to resist their exorcisms. Yet this want of success was owing solely to the weakness of their faith, and would seem to throw a shade on the foresight and penetration of their divine master. Why did he send missionaries whose dispositions were not sufficiently known to him? Besides, it belonged to him alone to bestow on them before hand a necessary stock of faith for their Journey.

Whatever opinion may be formed of this, there is reason for believing that the apostles, who never quitted their master, saw him continually operating, enjoyed his confidence, and had faith from the first hand—were better qualified to labour to the satisfaction of the public. Thus Jesus, fully resolved to make a desperate effort, renewed all their powers, and gave them his instructions, of which the following is the substance: "I have no money to give you, but strive to pick up for yourselves what you can. Providence will provide for you; If he takes care of the sparrows, he will take care of you. Moreover expect to be ill received, reviled, and persecuted; but be of good courage; all is for the best. Silence is no longer requisite; preach openly and on the house tops what I have spoken to you in secret. Inform the world that I am the Messiah, the son of David and

the Son of God. We have no longer to observe discretion; we must either conquer or die; away then with pusillanimity.

"Though I send you forth as sheep in the midst of wolves, explain to the good people that you are under the safeguard of the Most High, who will take a terrible revenge for the outrages offered you, and liberally reward those who welcome you.—You do not require to concert measures for supplying your expenses; it belongs to those whose souls you are going to save to provide for the wants of your bodies; carry not therefore either gold, or silver, or provision, or two suits of raiment; take a good cudgel, and depart in the name of the Lord.

"Take care in your way always to preach that *the kingdom of heaven is at hand.* Speak of the end of the world. On entering cities and villages, inform yourself underhand of such credulous people, as are very charitable and prepossessed in our favour. You will salute them civilly; saying *Peace be to this house.* But the peace you bring must be only *allegorical*; for my doctrine is calculated to create trouble, discord, and division, every where. Whoever would follow me must abandon father, mother, kinsmen, and family; we want only fanatic and enthusiasts; who, attaching themselves wholly to us, trample every human consideration under foot. *I came not to send peace but a sword.* As a like conduct might embroil you with your hosts, you will change your abode from time to time. Do not rely on the power I have of raising the dead: the safest way for you is not to risk your being killed; shun therefore places where you shall find yourselves menaced with persecution. Leave disobedient cities and houses, *shaking the dust from off your feet.* Tell them, that they have incurred the punishment of Sodom and Gomorrah. Declare, in my name, that the divine vengeance is ready to make them sensible of their guilt, and that the inhabitants of these cities will be less rigorously punished than those who shall have the audacity to resist your lessons. The great and last day is at hand: I assure you, that you shall not have finished your tour through all the cities of Israel, before the Son of man shall arrive*."

* St. Matt. x. St. Mark vi. St. Luke ix.

Such is the sense and spirit of the instructions which Jesus gave to his apostles. These trifles, however, scarcely merit notice:—We are more surprised to find the Son of God proclaiming peace and charity, and at the same time asserting that he brings war and hatred. It is besides unquestionable, that the apostles, and especially their successors in the sacred ministry, have in preaching their gospel brought on the world troubles and divisions unknown in all other preceding religions. The incredulous, who by the way refer to the history of the church, find, that the *glad tidings* which they came on purpose to announce, have plunged the human race into tears and blood*.

It is obvious from his language, that Jesus charged people of property with the maintenance of his apostles. Their successors have taken sufficient advantage of this and through it assumed an authority to exercise for many ages the most cruel extortions on impoverished nations.

Critics maintain also that it was false to say near eighteen hundred years ago *the end of the world was near*, and more false still to affirm that the great Judge would arrive before the apostles could have time to make the tour of the cities of Israel. It is true, theologists understand that the end of the world shall happen when all the Jewish cities, that is, when all the Jews shall be converted. Time will demonstrate whether it be in that sense we ought to understand the words of

* If the Christian religion be as is pretended, a restraint to the crimes of men;—if it produces salutary effects on some individuals—can these advantages, so rare, so inefficient and doubtful, be compared with the evident and immense evils which this religion has produced on the earth? Can the prevention of a few trifling crimes, some conversions useless to society, some sterile and tardy repentances, enter into the balance against the perpetual dissensions, bloody wars, horrid massacres, persecutions, and cruelties, of which the christian religion has been a continual cause and pretext? For one secret sinful thought suppressed by it, there are even whole nations armed for reciprocal destruction; the hearts of millions of fanatic are inflamed; families and states are plunged into confusion; and the earth is bedewed with tears and blood. After this, let common sense decide the magnitude of the advantages which mankind derive from the glad tidings which christians pretend to have received from their God.—*Christianity Unveiled.*

Jesus: meanwhile the world still remains, and does not appear to threaten speedy ruin.

It is likewise very probable, that, besides these public instructions, Jesus gave more particular ones to his apostles. They departed in the hope of charities which they were to receive from Jews, of whom the greatest number were already in a state of reprobation, or damned *in petto* by Providence. Jesus altered his orders in part; he reserved for himself the cities, and left the villages only to his apostles. Accordingly they went here and there, calling out, *Hearken to the glad tidings; the world is near its end. Repent therefore, pray, fast, and give us money and provisions, for having acquainted you with this interesting secret.* We are also assured, that they cured several diseases by the application of a certain *oil*. They had doubtless done more excellent things, but the *paraclete* (the comforter) was not yet come: maugre the instructions of the Son of God, the understandings of the apostles were not yet sufficiently brightened*; for we do not find that the missionaries, with their balsam and fine speeches, made many converts.

Jesus, now left alone, went about preaching through many cities of Galilee; but deprived of the assistance of his dear confidents, he did not in these places work any wonders.

ECCE HOMO

বিজ্ঞাপন

দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত উড়িষ্যা দেশের সাহায্য নিমিত্তে গত ৩১ বৈশাখ রবিবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া যে দান সংগ্রহ হইয়াছিল এবং তদবধি আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত যাঁহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তাঁহারদিগের নাম ও দান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহার মধ্যে কটক ও মেদিনীপুরে যাহা পাঠান হইয়াছে, তাহাতে তত্তৎ স্থানে অন্ন দান হইতেছে, এবং কতক লোকের কষ্ট নিবারণের উপায়ও হইয়াছে।

* St. Luke ix. 6. St. Matt. xi. St. Mark vi. 12.

৩১ বৈশাখ অবধি ৩২ আষাঢ় পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের আয় ব্যয় বিবরণ।

দান

৩১ বৈশাখ প্রাতে সমাজ কালীন	২৬৯ ।০
শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	২
" যদুনাথ দে	২
" চন্দ্রকুমার শুঁই	৫
" শ্রীরাম পালিত	৫
" উমেশচন্দ্র দত্ত	১
" বনমালি ঘোষ	।০
" গুরুচরণ মহালানবিষ	১
" বিজয় নাথ মুখোপাধ্যায়	১
" কাশীনাথ দে	২
" বল্লবীকান্ত ভট্টাচার্য্য	৫
" মদনমোহন দে	৪
" প্রসন্ননাথ সাহা	৫
" শীলের ফ্রী কালেজ	৩০
শ্রীমতী পঞ্চাননী দাসী	২০
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু	১
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসী	।১
একজন ব্রাহ্ম	১॥০
শ্রীযুক্ত রাজকিশোর চট্টোপাধ্যায়	১
" শ্রীনাথ যোগী	॥০
" গোকুল কৃষ্ণ সিংহ	১
" শশিভূষণ বসু	১৫
শ্রীমতী অন্নদেবী দাসী	১৮/
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব	২৫
তাঁহার পত্নী	১৫
শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র	১০
" বিহারীলাল মজুমদার	৩৯
কোন্ নগরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ	২১
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দেব	১০
শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দাসী	২
	৪৯৭।/
কটকে পাঠান যায় ২৫০	
মেদিনীপুরে পাঠান যায় .. ২০০	
	৪৫০
স্থিত	৪৭।/

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের আষাঢ় মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৩৪।৶০
পুস্তকালয়	৪৪(১০
যন্ত্রালয়	১৪৫৸৫
ডাক মাসুল	২৮॥৶০
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	১২৩৸৶০
দানপ্রাপ্ত	॥৴০
পুরাতন ছিন্ন কাগজ বিক্রয় ..	১॥৶০
গচ্ছিত	৩৮৴১৫
	৬১৭৶১০

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৭৭৸১৫
মাসিক বেতন	১১০৵১০
যন্ত্রালয়	১৪২॥৵০
ডাক মাসুল	৩২৸৴০
পুস্তকালয়	৩৯৶০
অনিরূপিত	৯৸৫
আলোকের ব্যয়	২৪৸৵১০
দুর্ভিক্ষের উপশমার্থ মেদিনীপুরে প্রেরিত	২০০
গচ্ছিত	৩৯॥০
	৬৭৬৸০

আয়	৬১৭৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৩১৴১০
	৮৪৮৴০
ব্যয়	৬৭৬৸০
স্থিত	১৭১॥৴০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের আষাঢ় মাসের দানের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু	১
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	১
	৩

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
	৫

আয়	৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৯৪৸০
	৯৯৸০

ব্যয়

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য মেদিনীপুর সমাজে দান	১০
	৮৯৸০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে ৭॥০ সাড়ে সাত ঘন্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ১২ শ্রাবণ শুক্রবার।

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
২৭৭ সংখ্যা। ভাদ্র ১৭৮৮ শক। ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
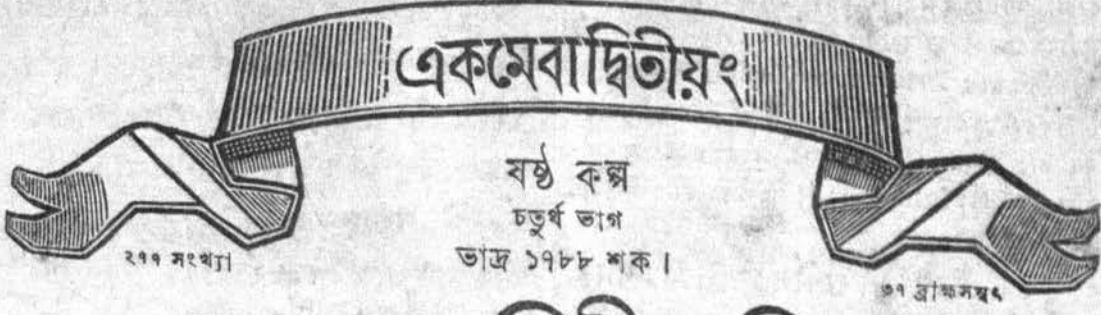
ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে দশমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৭৯

১। অশ্বাবতি প্রথমো গোষু গচ্ছতি সুপ্রাবীরিন্দ্র মর্ত্য স্তবোতিভিঃ। তমিৎপৃণক্ষি বসুনা ভবীয়সা সিন্ধুমাপো যথাভিতো বিচেতসঃ।

১। হে 'ইন্দ্র' যঃ 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'তব উতিভিঃ' ত্বদীযৈঃ রক্ষণৈঃ 'সুপ্রাবীঃ' সুষ্ঠু প্ররক্ষিতো ভবতি স মর্ত্ত্যঃ 'অশ্বাবতি' বহুভিঃ অশ্বৈঃ যুক্তে গৃহে বর্ত্তমানঃ 'গোষু' প্রাপ্তব্যেষু 'প্রথমঃ' 'গচ্ছতি' সর্ব্বেভ্যো যজমানেভ্যঃ পূর্ব্বমেব গোমান্ ভবতীত্যর্থঃ। ত্বং 'তমিৎ' তমেব পুরুষং 'ভবীযসা' বহুতরেণ ভবিতৃতমেন বা শতসহস্রাদিসংখ্যা-যুক্তেন 'বসুনা' ধনেন 'পৃণক্ষি' সংপৃক্তং সংপূর্ণং করোষি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'বিচেতসঃ' বিশিষ্টজ্ঞানহেতুভূতা আপঃ। 'যথাভিতঃ' সর্ব্বাসু দিক্ষু 'সিন্ধুং' সমুদ্রং পূরযন্তি তদ্বৎ।

১। হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য তোমার প্রযত্নে রক্ষিত হয়, সে প্রভূত-অশ্ব-সম্পন্ন গৃহে অবস্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে গো লাভ করিয়া থাকে। যেমন চেতন লাভের হেতু সলিল সমুদায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্রকে পূর্ণ করে, সেই রূপ তুমিই তাহাকে প্রচুর অর্থে পরিপূর্ণ করিয়া দেও।

৮৮০

২। আপো ন দেবীরুপযন্তি হোত্রিয়মবঃ পশ্যন্তি বিততং যথা রজঃ। প্রাচৈর্দেবাসঃ প্রণযন্তি দেবযুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষযন্তে বরাইব।

২। 'হোত্রিযং' হোতুঃ স্বভূতং চমসং 'দেবীঃ' দেব্যঃ দ্যোতমানাঃ 'আপঃ' 'ন' যথাপঃ 'উপযন্তি' উপগচ্ছন্তি তদ্বদুপরি বর্ত্তমানা দেবা এতমেব চমসং 'অব' অবস্তাৎ 'পশ্যন্তি' হোতৃচমসে অস্মাকং সোমাভিষবায আপঃ পূরিতা ইতি তেষাং দৃষ্টিরপ্যস্মিন্ সংলগ্না অভূৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'বিততং' বিস্তীর্ণং 'রজঃ' জ্যোতিঃ সূর্য্যসম্বন্ধি 'যথা' নিরন্তরমবস্থাৎ পততি তদ্বৎ। 'দেবযুং' দেবান্ কামযমানং এতং চমসং 'প্রাচৈঃ' প্রাচীনং যদ্বা প্রাঞ্চৈঃ প্রাগমনৈঃ উত্তরবেদ্যভিমুখং হোমকালে 'প্রণযন্তি' হোমার্থে প্রণীতং 'ব্রহ্মপ্রিযং' ব্রহ্মণা সোমলক্ষণেন অন্নেন প্রীতং সম্যক্ প্রং পূরিতমিত্যর্থঃ 'জোষযন্তে' 'দেবাসঃ' সর্ব্বে দেবাঃ তং চমসং সেবন্তে 'বরাঃ ইব' কন্যকাং যথা বরাঃ মমেযং ভবিষ্যতি মমেযং ভবিষ্যতীতি কন্যকাং সেবন্তে এবং দেবা অপি মমাযং সোমঃ মমাযং সোম ইতি অস্য পার্শ্বে বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। এবমপোনপ্ত্রীযবিনিযোগানুসারেণ যোজিতং মন্ত্রস্যানুষ্ঠেযার্থপ্রকাশকত্বাৎ। যদাতু রাত্রি

পর্য্যায়েস্যা বিনিযোগ স্তদা ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ং। হে ইন্দ্র দেব্যঃ আপঃ যথা নিম্নদেশং উপগচ্ছন্তি এবং দেবাঃ ত্বদীয়ং স্তোত্রং শুশ্রূষমানাঃ হোত্রিয়ং হোতৃসম্বন্ধি ধিষ্ণ্য-স্থানমুপগচ্ছন্তি উপগত্যচ অবস্তাৎ পশ্যন্তি বিততং জ্যোতিরিব দেবয়ুং দেবান্ আত্মনঃ ইচ্ছন্তং এতং শংসিতারং আগতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ প্রাচীনং প্রণয়ন্তি অগ্রতঃ ধারয়ন্তি ব্রহ্মপ্রিয়ং স্তোত্রপ্রিয়ং ত্বাং শং সন্তং বরাঃ কন্যকাং ইব সেবন্তে।

২। দেবগণ দীপ্তিশীল সলিলের ন্যায় হোতার চমসের নিকট গমন ও বিস্তীর্ণ সূর্য্য জ্যোতির ন্যায় তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং হোম কালে সেই চমসের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে সংশোধন ও বরেরা যেমন কন্যার সেবা করে সেই রূপ সেই সোমরস পূর্ণ চমসের সেবা করিয়া থাকেন।

৮৮১.

৩। অধি দ্বয়োরদধা উকথ্যং বচো যতস্রুচা মিথুনা যা সপর্য্যতঃ। অসংযতো ব্রতে তে ক্ষেতি পুষ্যতি ভদ্রা শক্তির্যজমানায় সুন্বতে।

৩। হে ইন্দ্র 'দ্বয়োঃ' হবির্ধানয়োঃ 'উকথ্যং' উকথং শস্ত্রং তদ্‌যোগ্যং 'বচঃ' যুজে বাং ইত্যাদি মন্ত্ররূপবচনং 'অধি' 'অদধাঃ' নিহিতবানসি। ননু হবির্ধানয়োর্দ্বয়োঃ কথং একমেব বচঃ অধিনিধীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য ব্রাহ্মণেনৈবং ব্যাখ্যাতং অধিদ্বয়োরদধা উকথ্যং বচ ইতি দ্বয়োর্হ্যেতত্তৃতীয়ং ছদিরধিনিধীয়তে উকথ্যং বচ ইতি যজ্ঞিয়ং বৈ কর্ম্মোকথ্যং বচো যজ্ঞমেবৈতেন সমর্দ্ধয়তীতি। তত্র যথা হবির্ধান দ্বয়োরেকমেব তৃতীয়ং ছদিরধিনিধীয়তে এবং স্তোত্রমপ্যেকং যুক্তং। উক্তং নাম যজ্ঞসম্বন্ধি শস্ত্রং তদ্‌যোগ্যং বচনমপি যজ্ঞিয়ং কর্ম্ম তস্য যজ্ঞরূপযোঃ হবির্ধানয়োর্যজ্ঞত্বসম্পাদনায়াধিনিধানাদ্‌যজ্ঞোপি সমৃদ্ধো ভবতি। কীদৃশয়োঃ হবির্ধানয়োঃ 'যতস্রুচা' যতাঃ সম্বদ্ধাঃ স্রুচঃ গ্রহচমসাদিলক্ষণানি পাত্রাণি যয়োঃ তে 'মিথুনা' যুগলরূপেণ বর্ত্তমানে 'যা' যে হবির্ধানে ত্বাং 'সপর্য্যতঃ' পূজয়তঃ তয়োরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ঈদৃগ্রূপোহবির্ধানযুক্তঃ যজমানঃ 'অসংযতঃ' শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধার্থমনভিগতঃ সন্ 'তে' 'ব্রতে' ত্বদীয়ে কর্ম্মণি 'ক্ষেতি' নিবসতি 'পুষ্যতি' চ প্রজয়া পশুভিঃ পুষ্টোকল্যাণী 'শক্তিঃ' উৎকৃষ্টং বলং ভবতি এতৎ সর্ব্বং হবির্ধানয়োরুকথ্যস্য বচসঃ অভিধানেন ত্বয়া কৃতমিত্যর্থঃ।

৩। স্রুক চমসাদিযুক্ত যুগল রূপে বর্ত্তমান তোমার পূজার নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় হবির্ধান নামক যজ্ঞপাত্র দ্বয়ের সামগান তুমিই বিধান করিয়াছ। এই প্রকার হবির্ধান পাত্রযুক্ত যজমান যুদ্ধার্থ সমাগত না হইয়া ত্বদীয় ব্রতে অবস্থান করে, প্রজা ও পশুগণ দ্বারা পরিপুষ্ট হয় এবং সোম সংস্কার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বল লাভ করে।

৮৮২

৪। আদঙ্গিরাঃ প্রথমং দধিরে বয় ইদ্ধাগ্নয়ঃ শম্যা যে সুকৃত্যয়া। সর্ব্বং পণেঃ সমবিন্দন্ত ভোজনমশ্বাবন্তং গোমন্তমাপশুং নরঃ।

৪। যদা পণিভির্গাবোপহৃতাঃ তদানীং 'অঙ্গিরাঃ' অঙ্গিরসঃ প্রথমং পূর্ব্বং অগ্রতঃ 'বয়ঃ' হবির্লক্ষণমন্নং 'দধিরে' ইন্দ্রার্থং সম্পাদিতবন্তঃ। 'আৎ' অনন্তরং তাদৃশাঃ 'যে' অঙ্গিরসঃ 'ইদ্ধাগ্নয়ঃ' প্রজ্বলিতাগ্নিযুক্তাঃ সন্তঃ 'সুকৃত্যয়া' শোভনকরণোপেতয়া 'শম্যা' কর্ম্মণা শোভনেন যাগেন ইন্দ্রং অযজন্নিতি শেষঃ। তে 'নরঃ' যজ্ঞস্য নেতারঃ অঙ্গিরসঃ 'পণেঃ' এতন্নাম্নোঽসুরস্য সম্বন্ধি 'সর্ব্বং' 'ভোজনং' ধনং 'সং' 'অবিন্দন্ত' সমলভন্ত। কীদৃশং 'অশ্বাবন্তং' অশ্বৈর্যুক্তং 'গোমন্তং' গোভির্যুক্তং 'আ' সমুচ্চয়ে 'পশুং' গবাশ্বব্যতিরিক্তং অন্যৎ পশুজাতঞ্চ সমবিন্দন্ত।

৪। যখন পণিনামক অসুরগণ অঙ্গিরাদিগের গো সমূহ অপহরণ করিয়াছিল, তখন অঙ্গিরাগণ প্রথমে ইন্দ্রের নিমিত্ত হবিরূপ অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তৎপরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উৎকৃষ্ট উপকরণ সম্পন্ন যাগ দ্বারা ইন্দ্রের অর্চ্চনা করেন, সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে তাঁহারা সেই অসুরগণের গো অশ্ব ও অন্যান্য পশু প্রভৃতি সমস্ত ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮৮৩

৫। যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্তেতে ততঃ সূর্য্যো ব্রতপা বেন আজনি। আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য জাতমমৃতং যজামহে।

৫। পণিভিরপহৃতাসু গোষু 'অথর্ব্বা' এতৎসংজ্ঞকঋষিঃ 'যজ্ঞৈঃ' ইন্দ্রদেবত্যৈরনুষ্ঠিতৈর্যাগৈঃ 'পথঃ' গোসম্ব-

ঙ্গিনোমার্গান্ 'প্রথমঃ' 'ততে' তনুতে সর্ব্বেভ্যঃঋষিভ্যঃ পূর্ব্বমেব কৃতবানিত্যর্থঃ। 'ততঃ' তদনন্তরং 'ব্রতপাঃ' ব্রতানাং কর্ম্মণাং পালযিতা 'বেনঃ' কান্তঃ 'সূর্য্যঃ' সূর্য্যরূপঃ ইন্দ্রঃ 'আজনি' গবাং প্রদর্শনাযাবিরভূৎ। ততোথর্ব্বা তাঃ 'গাঃ' 'আ' 'আজৎ' আভিমুখ্যেন প্রাপ্নোৎ। তাদৃশস্যেন্দ্রস্য 'কাব্যঃ' কবেঃ পুত্রঃ 'উশনাঃ' ভৃগুঃ 'সচা' অসুরনিরসনায সহাযঃ অভূৎ। 'যমস্য' অসুরাণাং নিযমনার্থং 'জাতং প্রাদুর্ভূতং 'অমৃতং' মরণ রহিতং তমিন্দ্রং 'যজামহে' হবির্ভিঃ পূজযামঃ।

৫। মহর্ষি অথর্ব্বা প্রথমে যজ্ঞ দ্বারা গো সমূহের পথ প্রস্তুত করেন, তৎপরে ব্রতপালক সূর্য্যের রূপ ইন্দ্র গো-সমূহ প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অনন্তর অথর্ব্বা গো সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন। কবি-পুত্র উসনা অসুর-বিনাশার্থ ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন। আমরা অসুর দমনের নিমিত্ত আবির্ভূত, মৃত্যু-বর্জ্জিত সেই ইন্দ্রকে পূজা করি।

৮৮৪

৬। বর্হির্ব্বা যৎ স্বপত্যায় বৃ-জ্যতে র্কো বা শ্লোকমাঘোষতে দিবি। গ্রাবা যত্র বদতি কারু-রুক্থ্য ১ স্তস্যেদিন্দ্রো অভি-পিত্বেষু রণ্যতি। ১। ৬। ৪।

৬। 'স্বপত্যায' শোভনপতনহেতুভূতায কর্ম্মণে 'বর্হিঃ বা' 'যদ্' যদা 'বৃজ্যতে' ছিদ্যতে অধ্বর্য্যুণা যাগার্থমাহ্রিযতে 'অর্কঃ বা' স্তোত্রনিষ্পাদকোহোতাবা শ্লোকং স্তুতিরূপাং বাচং 'দিবি' দ্যোতমানে যজ্ঞে যদা 'আ ঘোষতে' উচ্চারযতি। 'যত্র' যস্মিন্ কালে 'গ্রাবা' অভিষবার্থং প্রবৃত্তঃ উপলঃ 'বদতি' শব্দং করোতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'কারুঃ' উক্থ্যঃ' লুপ্তোপমমেতৎ। উকথ্যস্য শস্ত্রস্য শংসিতা কারুঃ স্তোতা যথা অভিমতশব্দং করোতি তদ্বৎ। 'তস্য' পূর্ব্বোক্তস্য সর্ব্বস্য 'অভিপিত্বেষু' অভিপ্রাপ্তিষু 'ইন্দ্রঃ' 'রণ্যতি' রমতে। যদ্বা পূর্ব্বোক্তানাং বর্হিরাদীনামভি প্রাপ্তিষু সতীষু ইন্দ্রঃ রণ্যতি অস্মদীযোযাগো ভবিষ্যতীতি হর্ষশব্দং করোতি। ১। ৬। ৪।

৬। পাতিত্য-নাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যখন কুশ সকল আহৃত হয় যখন স্তোত্র-নিষ্পাদক হোতা শ্লোক পাঠ করেন এবং যে কালে যজ্ঞ-প্রস্তর সকল সাম গায়কের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে, তখন ইন্দ্র কুশাদি আহৃত দেখিয়া আনন্দ ধ্বনি করিয়া থাকেন। ১। ৬। ৪।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৭ শ্রাবণ রবি বার ১৭৮৮ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

প্রার্থনা না করিতে করিতে সেই পিতা-মাতা আমারদের সম্মুখে বর্ত্তমান। তাঁহার সেই মঙ্গল-ভাব এখানেই দীপ্যমান। তাঁর অমৃত প্রভা এখান হইতে উত্থিত হইয়া দ্যুলোককে অতিক্রম করত সর্ব্বত্র প্রসারিত রহিয়াছে। সেই জ্ঞান-জ্যোতি অমৃত-সরোবরে সমুদায় জগৎ নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সমুদ্র মধ্যে যেমন প্রবাল দ্বীপ-সকল, জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে তেমনি এই জগৎ সংসার প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সেই জ্ঞান-মঙ্গল-জ্যোতিঃ-পূর্ণ পরমেশ্বরের ক্রোড়ে এই অগণ্য নক্ষত্র-খচিত অসীম আকাশ অবস্থিতি করিতেছে। এক বার জ্ঞান-চক্ষুকে উন্নত করিয়া দেখ, দেখিবে যে সেই জ্ঞান-সমুদ্রে, প্রেম-সমুদ্রে, এই জগৎ সংসার নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে—সমুদয় জগৎ সেই প্রেমময় মাতার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। এক জন নয়, এক প্রাণী নয়, এ-কটি আত্মা নয়, অগণ্য লোক-নিবাসী অগণ্য জীব তাহারদের সমুদয় কামনার সহিত সেই অনন্ত প্রেম-সাগরে অবস্থিতি করিতেছে—সেখান হইতে সকলেই আপন আপন কামনার বিষয় লাভ করিতেছে, অন্নপানে পুষ্ট হইতেছে, জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইতেছে। কামনার সমুদয় বিষয় সেই এক পরমেশ্বরের নিকট হইতে সকলেই প্রাপ্ত হইতেছে। সেই পরমেশ্বরের নাম কি? তাঁহার নাম নাই। সেই পরমেশ্বরের

রূপ কি? তাঁহার রূপ নাই। তিনি নাম-রূপের অতীত। তিনি অসীম বলিয়া যদি বলি তাঁর নাম আকাশ "আকাশোবৈ নাম" তথাপি আকাশ তাঁহার নাম নয়—তিনি নাম-রূপের অতীত, তিনি নাম-রূপের স্রষ্টা। তবে তিনি কে? তিনি সেই সত্য—তিনি ব্রহ্ম, তিনি ভুমা, তিনি বৃহৎ, তিনি মহৎ; তাঁহা অপেক্ষা বড় আর কেহই না, তাঁহার উপর শ্রেষ্ঠ আর কোথাও নাই। (আমরা কখনো তাঁহাকে ওঁ বলি, কখনো তাঁহাকে হূ বলি—কিন্তু তাঁহার নাম নাই। ঋষিরা ওঁ বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন, আরবেরা হূ বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করে; কিন্তু তাঁর নাম ওঁও নয়, তাঁর নাম হূও নয়।) তাঁর নাম নাই, তাঁর রূপ নাই—তিনি নাম-রূপের অতীত, তিনি নাম-রূপের নির্ব্বহিতা। ঈশ্বর আকাশের অতীত, সকল নাম-রূপের অতীত; অথচ আকাশের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তিনি নাম-রূপ-জগৎকে রক্ষা করিতেছেন। আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ এই শরীরস্থিত আত্মা; ঈশ্বর অনন্ত গুণে এই পরিমিত আত্মার অতীত হইয়াও ইহার (সযুজা) ও সখা হইয়া ইহাকে নিয়ত পালন করিতেছেন। তিনি সংসার কালের অতীত হইয়াও সংসারের পিতা-মাতা হইয়া ইহাকে পোষণ করিতেছেন। তিনি পিতা-মাতা হইতে অধিক, তিনি পিতা-মাতার মনে স্নেহ প্রেরণ করিতেছেন। সেই পরমেশ্বরের নাম নাই রূপ নাই, তাঁর পূর্ণতার খর্ব্বতা নাই; তিনি আপনার স্বরূপ বিনাশ করেন না, তিনি এক হইয়া আপনাকে আর এক রূপে দেখান না; তিনি নিত্য স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করেন। তিনি নির্ব্বিকার, তিনি সদাই সমান-রূপে আপনাকে প্রকাশ করেন—তিনি এই জগতের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি সমুদয় জগৎকে আলো করিয়া রহিয়াছেন। যাহা ক্ষুদ্র, তাহা তিনি নহেন; তিনি ভুমা। সেই ভুমাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, সেই ভুমাকে অনুসন্ধান কর, সেই ভুমারই শরণাপন্ন হও। আমারদের আত্মা ক্ষুদ্র হইয়া যদি ভুমা ঈশ্বরের আশ্রয় না পাইত, দুর্ব্বলের বল যদি তিনি না হইতেন; তবে আমারদের এখানে আর দুর্দ্দশার শেষ থাকিত না—আমরা দীন-ভাবে মুহ্যমান হইয়া সদাই শোক করিতাম, আমারদের হৃদয়ের বেদনা আর কিছুতেই যাইত না। আমরা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া নির্ভয় হইয়াছি, আরাম পাইয়াছি—যার পর বল নাই, যার পর প্রেম নাই, যার পর মঙ্গল-ভাব নাই; তাঁহাকে আমরা সহায় পাইয়াছি। তিনি প্রতি জনের আত্মাতে সাধু ইচ্ছা প্রেরণ করিতেছেন, আমারদের কুটিল অভিসন্ধি-সকলকে দমন করিতেছেন, আমারদের ধর্ম্মের পুরস্কার গোপনে বিধান করিতেছেন। লোকেরা যদি নির্দ্দোষের উপর দোষারোপ করে, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই অপবাদ হইতে রক্ষা করেন; লোকে যদি তাঁহাকে ত্যাগ করে, তিনি তাঁহাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন—তাঁর হৃদয়ে শান্তি-সুখ প্রেরণ করেন। আমারদের আদর্শ ঈশ্বর—আমরা সেই দেব-ভাব দেখিয়া মনুষ্য-লোকে তাহা আনিবার জন্য চেষ্টা করি; তাহাতে যদি সকল ইচ্ছা সম্পূর্ণ না হয়, ঈশ্বর সেই সাধু ইচ্ছার পুরস্কার দেন। যদি ঈশ্বর আত্মার আশ্রয় না হইতেন, তাহা হইলে কে এত দুঃখ বহন করিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে পারিত। আমারদের আত্মার আশ্রয় পরমাত্মা না থাকিলে এই সংসারের কুটিলতা হইতে কি রূপে আমরা রক্ষা পাইতাম। আমরা ধর্ম্ম ভাবিয়া ধর্ম্ম-প্রচারের

জন্য লোকের সঙ্গে যোগ দিতে যাই, তাহারা আমারদিগকে সেই ধর্ম্ম হইতে, সদ্ভাব হইতে, ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করে। আমরা ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিতে যাই, লোকেরা আসিয়া সেই শান্তি হরণ করিতে চেষ্টা করে—আমারদিগকে অভয়-পদ হইতে পরিচ্যুত করিবার জন্য মোহ-কোলাহল উত্থিত করিয়া কর্ণকে বধির করিয়া দেয়। পরমেশ্বর আমারদের সহায়—এই ভয়াবহ সংসারে আমরা মুমুক্ষু হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি, তিনি আমারদিগকে রক্ষা করুন।

হে পরমাত্মন্! আমরা উন্নত হইয়া তোমার নিকট আগমন করি নাই, নত হইয়াই তোমার নিকটে আসিয়াছি যে তুমি উন্নত করিবে। আমরা পুণ্যবান্ হইয়া তোমার নিকট আগমন করি নাই, পাপী হইয়াই আসিয়াছি যে তুমি পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে—অজ্ঞান ও দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিবে। দুঃখী হইয়াই তোমার আশ্রয় লইয়াছি যে দুঃখ-দুর্দ্দিনের অবসান হইবে—আমরা সম্পদে স্ফীত হইয়া তোমার নিকট আগমন করি নাই। আমরা কুৎসিত ও মলিন হইয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি যে তুমি সেই মলিনতা পরিহার করিয়া হৃদয়কে সৌন্দর্য্য ও সাধু-ভাবে পূর্ণ করিবে। অসৎ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি যে তুমি সৎ পদবীতে লইয়া যাইবে; অন্ধকারে ভীত হইয়া তোমাকে অনুসন্ধান করিতেছি যে তুমি স্বপ্রকাশ আলোকে লইয়া যাইবে; মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি যে তুমি অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাইবে। আমারদের সকলি দুর্গতি, সকলি দুর্দশা—কেবল তুমি একমাত্র আমারদের সম্পদ্। তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া সৎকে—জ্যোতিকে—অমৃতকে প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি হৃদয়ে যে বিশ্বাস দিয়াছ, তাহা কখনই ব্যর্থ যাইবে না; আমরা নিশ্চয় জানিতেছি। হে পরমাত্মন্! অসৎ হইতে আমাকে সৎ-স্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

নবম উপদেশ।

ঈশ্বরের সত্য ভাব ও আমাদের উপর তাঁহার অধিকার।

"তিনিই সত্য, তিনিই আমাদের প্রভু।"

যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, জগতের অস্তিত্ব যাঁহার অস্তিত্বের উপর একান্ত নির্ভর করে, যদি সমুদায় সৃষ্টি ধ্বংস হয়, পরেও যিনি বর্ত্তমান থাকিবেন; তিনি ব্যতীত আর কে সত্য শব্দের প্রতিপাদ্য হইতে পারে? অস্তিত্বই সত্যের প্রকৃতি; অতএব ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই যাঁহার অস্তিত্ব সমান, সমুদায় দেশ যাঁহার সত্তায় পরিপূর্ণ, জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ভাবের অস্তিত্ব যাঁহাতে পূর্ণ-রূপে বর্ত্তমান; তিনিই প্রকৃত সত্য পদার্থ। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ যাঁহার ইচ্ছায় অসদবস্থা হইতে সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই সকল সত্যের এক মাত্র মূল। তাঁহার সত্য-ভাবই আর সকলের সত্য-ভাবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, যে আত্মা ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, এ উভয়ই এক সময়ে অসৎ অবস্থায় ছিল; সেই সত্য-স্বরূ-

পই ইঁহারদিগকে সম্ভাবে আনয়ন করিলেন। অতএব যিনি এ অসৎ জগৎকে সত্য করিয়াছেন এবং ইচ্ছা হইলে এই সমস্ত সত্যকে পুনরায় একে বারে অসৎ করিতে পারেন; তিনিই সত্যের সত্য পরম সত্য।

যিনি সেই সত্যকে জানিতে পারেন, তিনিই আর সকল সত্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। সেই অপ্রতিম সত্যের ভাব যাঁহার জ্ঞান-ক্ষেত্রে পরিস্ফুরিত হয় নাই, তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাবে সঞ্চরণ করে। ইহা অযথার্থ নহে যে, অধিকাংশ মনুষ্য এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎকে যে পরিমাণে সত্য বলিয়া অনুভব করে; ঈশ্বরের সত্য ভাব সেরূপ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্যের আত্মা প্রায় সর্ব্বদা বহির্ব্বিষয়েই পর্য্যটন করে, অন্তর্দৃষ্টির উত্তেজনা এ জগতে অতি অল্পই হইয়া থাকে। এখানে আত্মার বাল্য কাল, আত্মার প্রভাব এখানে তত দূর পরিস্ফুটিত হয় না; সুতরাং আত্মা প্রতিনিয়তই রূপ রস প্রভৃতি বহির্ব্বিষয়ের আকর্ষণেই অভিভূত হইতেছে; বহির্ব্বিষয়ের সংসর্গেই আত্মা অধিক কাল অতিবাহিত করে; শরীরের অনুরোধে ও প্রবৃত্তির অনুরোধে এখানে আত্মাকে বাধ্য হইয়া বাহ্য বস্তু ও বহির্ব্বিষয়েরই সেবা করিতে হয়; এই রূপ আত্মার ধ্যান ধারণা, আশা কল্পনা, ও প্রীতি কামনা সমুদায়ই বহির্ব্বিষয়ে বদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং বাহ্য বস্তুই তাহার সর্ব্বস্ব হয় এবং তাহাকেই সার সত্য বলিয়া জ্ঞান করে। তথাচ কোন কোন মহাত্মার অন্তরে ঈশ্বরের নিগূঢ় সত্য ভাব সময়ে সময়ে যে আবির্ভূত হয়, ইহাই পৃথিবীর পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু যখন কোন কোন মহাত্মা ঈশ্বরের সত্য-ভাব ধারণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে "সত্যস্য সত্যং" "সত্যস্য পরমং নিধানং" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতি আত্মাতেই যে তাঁহার সত্য-ভাব গ্রহণ করিবার সামর্থ্য বিদ্যমান আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি ব্রহ্মদর্শনের প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিবেন, তিনি অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।

ঈশ্বর সত্য, এই জ্ঞানটি আপনাতে নিরন্তর জাগরূক রাখাই সিদ্ধি লাভের এক মাত্র উপায়। এই জ্ঞানটি যত ক্ষণ অভিভূত না হয়, তত ক্ষণ কেহই কল্যাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। এই জ্ঞান যত প্রস্ফুটিত হইবে, ঈশ্বরের স্বরূপ ততই জানিতে পারা যাইবে; কেন না তাঁহার স্বরূপ তাঁহার সত্য-ভাবের অভ্যন্তরেই অভিনিবিষ্ট আছে। এই জগৎ প্রতিক্ষণেই তাঁহার সত্য-ভাব প্রচার করিতেছে—আপনার সত্তার মূলাধার সেই পূর্ণ সত্যকে প্রকাশ করিতেছে—ভূলোক ও দ্যুলোক, স্থাবর ও জঙ্গম, জড় ও আত্মা, সকলে মিলিয়া সেই সত্যস্বরূপকে প্রদর্শন করিতেছে। দূরে নিকটে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্রই সেই সত্য-স্বরূপ দীপ্যমান হইয়া আছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালই তাঁহাকে বর্ত্তমান বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে। জ্ঞানগর্ভ কৌশল-সকল সেই সত্য-স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সকল শক্তিই সেই সত্যপুরুষের সংবাদ আনয়ন করিতেছে। শুভাবহ নিয়ম সমস্ত সেই সত্য-স্বরূপের আদেশকেই বহন করিতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন যে "তিনিই সত্য" তাঁহার তুল্য সত্য আর কিছুই নাই; সত্যের যে সকল লক্ষণ, তাহা কেবল তাঁহাতেই পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে। তথাপি জগৎকে একে বারে অসত্য বলা

যায় না। ঈশ্বর পূর্ণ সত্য; জগৎ তাঁহা হইতে নিঃসৃত অপূর্ণ সত্য। রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ ঈশ্বরকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে না; ঈশ্বর ইহাকে সৃষ্টি করিয়া আমাদের সহিত ইহার যে রূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তদনুসারেই ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। পরমাত্মা জড় ও জীবাত্মা এই উভয়বিধ জগৎ হইতেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি আপন ইচ্ছাতে জগৎকে উৎপন্ন করিয়াছেন; স্বয়ং জগৎরূপে আবির্ভূত হন নাই। এ জগৎ বাস্তবিকই জগৎ; মায়াও নহে, স্বপ্নও নহে। যাঁহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া সমুদায় জড়কেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যেমন এক দিকে ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; আর যাঁহারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সত্তা বিলুপ্ত করিয়া সমুদয়কেই পরমাত্ম-স্বরূপ বোধ করেন, তাঁহারাও সেই রূপ আর এক দিকে ভ্রমান্ধকারে নিপতিত হইয়াছেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে পূর্ণ সত্য ও জগৎকে অপূর্ণ সত্য বলিয়া দেখিতে পান, তাঁহারাই যথার্থদর্শী।

সেই সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরই আমাদের প্রভু। তিনিই আমাদিগের সত্তা ও জীবনের প্রেরয়িতা। তিনি আমাদের শরীর মন আত্মা সকলেরই বিধাতা। আমাদের যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় তিনিই প্রদান করিয়াছেন। তিনি বিনা-বাধ্যতায় আমারদিগকে মনুষ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আমারদিগকে উৎপন্ন না করিতেও পারিতেন। তিনি আমারদিগকে এ অবস্থা না দিয়া কোন অপকৃষ্ট অবস্থাও প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি যদি সেই রূপ করিতেন, কে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিত? আমরা যে স্বাধীনতা প্রভাবে মহাগৌরবের আস্পদ হইয়াছি, তাহাও তিনি প্রদান করিয়াছেন। অতএব যখন এ সকল বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই, তখন আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই বস্তু। তিনি আমাদের সর্ব্বপ্রকারে প্রভু। আমাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমারদিগকে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তাঁহার কোন প্রকার বাধ্যতা ছিল না; তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমারদিগকে এই এই প্রদান করিতে হইবে বলিয়া তাঁহার উপরে আমাদের কিছুই দাবি ছিল না; তিনি স্বকীয় উদারতাতে আমারদের যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার অধীন হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তিনি আমারদিগকে সুখ-সম্পদে সংস্থাপিত করুন, অথবা দুঃখ-বিপদে নিপাতিত করুন, তদ্বিষয়ে তাঁহার অক্ষুণ্ণ অধিকার আছে; তন্নিমিত্ত তাঁহার উপর অভিযোগ করিতে আমাদের কিছু মাত্র অধিকার নাই। তাঁহার ইচ্ছাকে আমাদের ইচ্ছার আয়ত্ত করিতে সংকল্প করা কখনই বিধেয় নহে। প্রত্যুত আমাদের ইচ্ছাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার ইচ্ছার বশীভূত করাই একান্ত উচিত; তাহা না করিলে তাঁহার প্রভুত্বের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। তিনি যে আদেশ করিবেন—আমাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দ্বারা যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, অক্ষুব্ধ হৃদয়ে তাহা প্রতিপালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি তজ্জন্য আমারদিগকে ম্রিয়মাণ হইতে হয়, তথাপি আমাদের মনে মনেও যেন তাঁহার উপর অভিযোগ উত্থাপিত না হয়।

আমরা যখন সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহারই, তখন আমাদের প্রতি তাঁহার সর্ব্ব-প্রকার ব্যবহারই শোভা পায়। কিন্তু যখন দেখি

যে, আমাদের প্রতি কেবল প্রভুত্ব প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই তিনি প্রভু হন নাই; প্রত্যুত আমারদের আত্মাকে উন্নত করিবার নিমিত্তই আমাদের প্রভু হইয়াছেন—যখন দেখি যে, তাঁহার প্রভুত্ব সুকঠোর প্রভু-শক্তির সমষ্টি নহে; প্রত্যুত বিমল নীতি ও কোমল করুণায় সেই প্রভুত্বের অভ্যন্তর পরিপূরিত আছে—যখন দেখি যে, আমরা যে সকল দুঃখ-ক্লেশ প্রাপ্ত হই, তাহা আমাদের বিনা দোষে নহে; প্রত্যুত আমরা মোহান্ধ হইয়া আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত যে অশুভ পথে পদার্পণ করিয়াছিলাম, আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারই নিষেধ দণ্ডরূপে আমাদিগের প্রতি প্রেরিত হইতেছে এবং যখন দেখি যে, প্রথমে তিনি অতি কোমল স্বরে আমাদের শুভ বুদ্ধিতে অসৎ পথে যাইতে নিষেধ করেন, তাহা কোন প্রকারে না শুনিলেই দুঃখ-ক্লেশ-রূপ কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া সুপথে লইয়া যান; তখন তাঁহার প্রতি অভিযোগ করা দূরে থাকুক, হৃদয়ের সমুদায় কৃতজ্ঞতা ও সমুদায় প্রীতি প্রবল বেগে তাঁহার প্রতি প্রবাহিত হয়। তিনি আমাদের এই প্রকার প্রভু। তাঁহার প্রভুত্ব আমাদের অসহনীয় নহে, প্রত্যুত আমাদের অমোঘ কল্যাণের হেতু। প্রভু হইয়া দাসদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করেন, এমন প্রভু আর কে আছেন? যদি এমন প্রভুর সেবা করিতে না পারি, তবে আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য। তিনি প্রভু হইয়াও আমাদিগকে অধীন করিতে চান না; এই জন্যই আমাদের হৃদয় তাঁহার অধীন হইতে চায়। আমরা দাস হইয়া শত শত বার তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছি, তথাপি তিনি প্রভু-শক্তি সত্ত্বেও ক্ষমা দানে মুক্তহস্ত হইয়া আছেন! যেন এমন প্রভুর বিরোধাচারী না হই। যেন বিশ্বস্ত দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকি।

তত্ত্ববিদ্যা।

উপসংহার।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে মূলতত্ত্ব-সকলকে শাখা প্রশাখা সমেত এত অধিক বিস্তার পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ করিবার তাৎপর্য্য কি? এ জিজ্ঞাসার যাহাতে সমূলে নিবৃত্তি হয় এই অভিপ্রায়ে অধুনা সুস্পষ্ট-রূপে দেখান যাইতেছে যে উক্ত শ্রেণী বন্ধন হইতে বহুতর ফল লাভ হইতে পারে; এতদন্যথায় "সত্য অথচ তাহাতে কোন ফল নাই" ইহা বলিতে গেলে, সত্যের কিছুই পরিচয় দেওয়া হয় না, প্রত্যুত আমাদের আপনারদেরই অযত্ন ও শৈথিল্যের পরিচয় দেওয়া হয়। উক্ত শ্রেণী-বন্ধনের সর্ব্বাবয়ব একত্র করিয়া এই রূপ পাওয়া যাইতেছে।

পরমাত্মা———	———জগৎ———	———সম্বন্ধমূলক প্রজ্ঞা।
অদ্বৈত	দ্বৈত-সাপেক্ষ	সার্ব্ব-ভৌমিক
পূর্ণ	অপূর্ণ	উন্নতিশীল
মূলাধার	আশ্রিত	প্রভাবময়

জগৎ

বিষয়ী	বিষয়	সম্বন্ধমূলক বুদ্ধি
এক	অনেক	সমষ্টি বদ্ধ
ভাবাত্মক	অভাবাত্মক	সীমাত্মক
স্বাধীন	পরাধীন	পরস্পরাধীন

বিষয়

কালিক	দৈশিক	সম্বন্ধমূলক
আবির্ভাব	আবির্ভাব	ইন্দ্রিয়-বোধ
ভূত	দীর্ঘ	গতি-সাপেক্ষ
বর্ত্তমান	প্রস্থ	বিস্তৃতি-সাপেক্ষ
ভবিষ্যৎ	বেধ	ঘনত্ব-সাপেক্ষ

উক্ত শ্রেণী-বন্ধন সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব। কেহ কেহ বলেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও লক্ষণ বিষয়ক জ্ঞান মনুষ্যের স্বতঃ-সিদ্ধ নহে। ইঁহারা বলেন যে এক আর একে দুই হয়, এই প্রকার তুচ্ছ জ্ঞান-সকলকেই যাহা কিছু সর্ব্ববাদি-সম্মত দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বর আ-ছেন, তিনি পূর্ণ-জ্ঞান মঙ্গল-স্বরূপ এবং সমু-দায়ের এক মাত্র স্রষ্টা, এবম্বিধ গুরুতর জ্ঞান-সকল ঈশ্বরানুগৃহীত বিশেষ বিশেষ মহাত্মার উপদেশ ব্যতীত কাহারো মনে স্বতঃ-উদয় হইতে পারে না। ইহার প্রত্যু-ত্তর এই যে উপদেশের কথা যখন হইল, তখন একে একে দুই হয়, ইহাও শিক্ষক-বিশেষের উপদেশানুসারে আমরা শিখি-য়াছি; কিন্তু উক্ত শিক্ষক কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছেন? আর এক শিক্ষকের নিকট হইতে। এ শিক্ষকও আবার আর এক শিক্ষকের নিকট হইতে উক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ রূপ শিক্ষক-পরম্পরার সংখ্যা কি অনন্ত? কেহই কি আপনা হইতে উক্ত জ্ঞানের সূত্র আ-বিষ্কার করেন নাই? অবশ্যই এক জন কেহ আপনার আন্তরিক স্বভাব হইতে উহার আভাস পাইয়া শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় তাহাই বহমান করত উহাকে উন্নতি-মুখে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা বলিয়া কি উহার স্বতঃ-সিদ্ধতা বিষয়ে আমাদের লেশ মাত্রও সংশয় হয়? আমরা কি এরূপ মনে করি যে শিক্ষক বলিয়াছেন বলিয়াই উহা আমারদের শিরোধার্য্য? প্রত্যুত আমরা কি এরূপ মনে করি না যে শিক্ষক বলুন বা না বলুন, উহা স্বতঃ-সিদ্ধ হও য়াতে উহার কোন প্রকারেই অন্যথা হইতে পারে না? এই রূপ যিনি মূল সত্য, তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয় ও জ্ঞান-স্বরূপ, ইহা আমরা যদিও শিক্ষক-বিশেষের নিকট হইতে প্রকাশ্য-রূপে প্রাপ্ত হই-য়াছি, তথাপি উহা গূঢ়-রূপে আমাদের অ-ন্তরে আপনা আপনি ছিল, সুতরাং উহা স্বতঃ-সিদ্ধ—এবিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় হ-ইতে পারে না। এস্থলে এই আর এক প্রশ্ন আসিতে পারে যে "একে একে দুই হয়"—এই যৎসামান্য জ্ঞানও আমরা যে-খান হইতে পাইতেছি, "জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বর আছেন"—এই অত্যাবশ্যক জ্ঞানও কি সেই খান হইতে আসিতেছে? ইহার উত্তর এই যে আত্মা এক না হইলে একের ভাব কোথা হইতে আসিত? বিষয় অনেক না হইলে অনেকের ভাব কোথা হইতে আসিত? জ্ঞান সমষ্টি-বদ্ধ না হইলে সম-ষ্টির ভাব কোথা হইতে আসিত? অতএব ইহাতে আর সংশয় কি যে উক্ত তিনটি মূল-তত্ত্বের প্রসাদেই এক এবং এক, এ দু-য়ের সমষ্টি দুই রূপে পরিগণিত হইতে পারিতেছে। অতত্রব সংখ্যা-সম্বন্ধীয় স্বতঃ-সিদ্ধতা এবং আত্মা বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় স্বতঃ-সিদ্ধতা, উভয়ই যে একই আকর হইতে অবতীর্ণ হইতেছে, ইহা একটুকুও অযথার্থ নহে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বিষয়ী আপন জ্ঞানে-তেই আপনি প্রকাশ পায়—বিষয়ী স্বপ্রকাশ; কিন্তু বিষয় সেরূপ নহে, কেননা উহা কেবল অন্যের জ্ঞানেতেই প্রকাশ পায়। অন্যের জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে গেলে সেই পর-কীয় জ্ঞানের নিয়মাধীন হইয়াই প্রকাশিত হইতে হয়, স্বাধীন-রূপে প্রকাশিত হওয়া যায় না। এই হেতু বিষয় আপনি যে রূপ সেরূপে আবির্ভূত না হইয়া বিষয়ীর অনু-রূপ ছদ্ম-বেশ ধারণ করিয়াই আবির্ভূত হয়; সুতরাং বিষয়-সকলের প্রকৃত ভাব এক রূপ এবং উহারদের আবির্ভাব আর এক রূপ। ইন্দ্রিয়-বোধ-সহকারে বিষয়ের আবির্ভাব

অগ্রে দেশ কালে প্রতিভাত হইলে পশ্চাতে উহার স্বরূপ-লক্ষণ-সকল বুদ্ধি-সংক্রান্ত প্রজ্ঞার যোগে অভিব্যক্ত হয়। বিষয়-সকল বাস্তবিক অনেক, অভাবাত্মক ও পরাধীন, অথচ উহারা এক ভাবাত্মক এবং স্বাধীন-রূপ ছদ্ম বেশ ধরিয়া দেশ কালে প্রবেশ করত ইন্দ্রিয়-প্রহরি-সকলকে প্রবঞ্চিত করে, কিন্তু বুদ্ধি সেই ছদ্ম-বেশ ভেদ করিয়া বিষয়ের বাস্তবিক লক্ষণ-সকল অবগত হইতে চেষ্টা করে; এবং প্রজ্ঞাতে উক্ত লক্ষণ-সকল অবিতথ-রূপে প্রকাশমান হয়।

অতএব বিষয়-সকল ইন্দ্রিয় সমক্ষে যে রূপ দেখায়; তাহা সত্য নহে, তাহা ভান মাত্র—তাহা জ্ঞান নহে, তাহা বোধ মাত্র। যথা ইন্দ্রিয়-সমক্ষে সূর্য্য অতিশয় অল্পায়তন বলিয়া বোধই হইতে পারে, জানা হইতে পারে না; কেবল বুদ্ধি দ্বারাই জানা হইতে পারে যে উহার আয়তন বাস্তবিক অতীব সুবিশাল। এই জন্য ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে ইন্দ্রিয়-বোধ বলা যেমন সঙ্গত, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বলা কখনই সে প্রকার সঙ্গত নহে। একটা মৃৎ-পিণ্ডকে হস্তে ধারণ করিলে ইন্দ্রিয়-সমক্ষে আপাততঃ বোধ হয় যে ইহা এক সংখ্যক, কিন্তু বাস্তবিক এই যে, অনেক পরমাণু দেশে সন্নিহিত থাকাতেই উহারা এক রূপে প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ দেশেতে উহার আবির্ভাব দৃষ্টে বোধ হয় যেন উহাতে একটা ভাব আছে; কিন্তু বাস্তবিক উহা অচেতন বস্তু—উহার ভিতরে কোন ভাব নাই। তৃতীয়তঃ বোধ হয় যেন উহা আপন শক্তিতে স্থিতি করিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক উহা সচেতনবৎ স্বাধীন বস্তু নহে—সুতরাং উহা অন্যের অধীনেই অবস্থান করিতেছে। বিষয়ের ইন্দ্রিয়-গোচর আবির্ভাব সকল যে প্রকারে দেশে এবং কালে এক-সংখ্যক ভাবাত্মক ও স্বতন্ত্র-রূপে প্রতিভাত হয়; তাহার পদ্ধতি এই রূপ, যথা—দেশ কালকে বিভাগ করিয়া এত দূর সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে যে তাহাতে এমন একটু অবকাশ থাকে না যেখানে ইন্দ্রিয়-বোধ-বিশেষ দাঁড়াইতে স্থান পায়; এমন একটি নিয়ম আছে যে অন্যূন এত পরিমাণ দেশ কালে ব্যাপ্ত না হইলে ইন্দ্রিয়-গোচর প্রতিমা-বিশেষ প্রকাশ পাইতে পারে না; সুতরাং যে কোন ইন্দ্রিয়-বোধকে আমরা ঐটুকু মাত্র দেশে অবস্থিত দেখি, তাহাকে তাহা-হইতে আর অধিক বিভাগ করিতে পারা যায় না; কেননা বিভাগ করিলেই তাহা অপ্রকাশ হইয়া যাইবে। এই রূপ অত্যল্প দেশ-ব্যাপী ইন্দ্রিয়-বোধকে যদি এক বলা যায়, তবে তাহার দ্বিগুণকে দুই বলিতে হয় এবং তাহার ত্রিগুণকে তিন বলিতে হয়; অথবা যদি তাহার দ্বিগুণকে এক বলা যায়, তবে তাহার চতুর্গুণকে দুই বলিতে হয় এবং তাহার ষড়্গুণকে তিন বলিতে হয়; এই রূপ করিয়া ইন্দ্রিয়-বোধ-সকল দেশে এক দুই বলিয়া পরিগণিত হয়। কালাত্যয় গণনারও ঐ একই রূপ প্রথা, যথা—ক অক্ষর উচ্চারণ করিতে কতক সময় লাগে এবং আমরা তাহার দ্বিগুণ সময়ে "কা" উচ্চারণ করিয়া থাকি। দীর্ঘ অপেক্ষা হ্রস্বকে আমরা দ্রুত উচ্চারণ করি, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও দ্রুত উচ্চারণ হইতে পারে, এত দ্রুত হইতে পারে যে তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে না। অতএব কোন শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য হইতে হইলে কিয়ৎ পরিমাণ কালাত্যয় উহার পক্ষে একান্তই আবশ্যক; এই একান্ত প্রয়োজনীয় কালাত্যয় টুকু যখন প্রথম বারে আবশ্যক হয়; তখন উহা যে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই আবশ্যক হয়, ইহা বলা বাহুল্য। উদাহরণ—প্রথমে "ক" উচ্চারণ করিবা-মাত্র

যৎকিঞ্চিৎ কাল সহকারে একটি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়; পরে যদি ক-য়ের পর খ, খ-য়ের পর গ, গ-য়ের পর ঘ উচ্চারণ করত প্রতি পদেই উক্ত পরিবর্ত্তন নবীভুত করা যায়, তাহা হইলে সময়ের বিভাগ সুস্পষ্ট রূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। কিন্তু যদি ক-খ-গ-ঘ র পরিবর্ত্তে উক্ত একই সময় ধরিয়া কেবল "কা" উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলেও সময়ের বিভাগ পূর্ব্বেরই ন্যায় বলবৎ থাকে, কেবল তত স্পষ্ট-রূপে অবধারিত হয় না; কেননা কোন ইন্দ্রিয়-বোধকে প্রথম বারে গ্রহণ করিতে গেলে যেমন কতক পরিমাণ কালাত্যয় আবশ্যক হয়, পরে আমরা যতক্ষণ তাহার প্রতি মনকে নিবিষ্ট রাখি, তত ক্ষণই সেই কালাত্যয় টুকু বহমান থাকা সেই রূপই আবশ্যক এবং উক্ত অত্যল্প মুহূর্ত্ত টুকুর দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ অনুসারে কালের ন্যূনাধিক্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলের ভাবাভাব-মূলক মাত্রা নির্ণয় সম্বন্ধেও ঐরূপ দেশ কালের নিয়ম বলবৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অতীব স্পষ্ট যে অনেক উজ্জ্বল বস্তু দেশে যত ঘনিষ্ট রূপে সন্নিহিত থাকে, তদীয় উজ্জ্বল ভাবের ততই মাত্রাধিক্য হয় এবং উহারা যত দূরে দূরে থাকে, ততই উক্ত উজ্জ্বল ভাবের মালিন্য হয়; ইহাও সুস্পষ্ট যে যত অল্প কালের মধ্যে যত অধিক ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, ততই ইন্দ্রিয়-বোধের প্রাখর্য্য হয় এবং যত অধিক কাল লইয়া যত অল্প ইন্দ্রিয় ক্রিয়া সাধিত হয়, ততই ইন্দ্রিয়-বোধের মান্দ্য হয়। উদাহরণ —বায়ুর স্পন্দন পরম্পরা কর্ণকুহরে আহত হওয়াতেই শব্দ-বোধ উদ্ভূত হয়; এতদবস্থায় ইহা সহজেই বোধ-গম্য হইতেছে যে এক স্পন্দনের পর অন্য স্পন্দন, তাহার পর আর এক স্পন্দন, এই রূপ ক্রিয়া কালেতে যত ঘনীভুত হয়—অর্থাৎ যত দ্রুত রূপে প্রবর্ত্তিত হয়—ততই শব্দের প্রাখর্য্য হয় এবং উক্ত ক্রিয়া কালেতে যত বিরল হয়, ততই শব্দের মন্দতা হয়।

তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয়-বোধের স্বাতন্ত্র্য, পরতন্ত্রতাও ঐরূপ দেশ কালের নিয়মাধীন। কার্য্য এবং কারণের মধ্যে দেশ-কাল-মূলক ছেদ যত অল্প হয়, ততই ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পায়; এবং উক্ত ছেদ যত অধিক হয়, ততই কার্য্য-ভাগের পরতন্ত্রতা প্রকাশ পায়। উদাহরণ—যদি এক পরমাণুর আকর্ষণ বশতঃ আর এক পরমাণু তাহার এতদূর সন্নিকৃষ্ট হয় যে উহারদের মধ্যে দেশের অবকাশ কিছুই উপলব্ধি না হইয়া উক্ত দুই পরমাণু এক পরমাণু-সদৃশ প্রতীয়মান হয়—তাহা হইলে "এই পরমাণুটি আকর্ষণ-ক্রিয়ার কারণ ও ঐ পরমাণুটিতে উহার কার্য্য ফলিত হইতেছে" এবংপ্রকারে কার্য্য এবং কারণকে পৃথক্ রূপে নির্ণয় করা সাধ্য হয় না; প্রত্যুত এই রূপ বোধ হয় যেন কার্য্যত্ব এবং কারণত্ব একই পরমাণুতে অবস্থান করিতেছে, একই পরমাণু যেন আপনারই উপর কার্য্য করত আপনাকে আপনার নিয়মাধীন করিতেছে; এই প্রকার পদ্ধতি-অনুসারেই ইন্দ্রিয়-বোধসকল স্বতন্ত্র-রূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যদি একটি আকর্ষণকারী পরমাণু ও আকৃষ্ট পরমাণুর মধ্যে অন্য কোন সামগ্রী বা কতক পরিমাণ শূন্য আকাশ ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে কার্য্য এবং কারণ বিভিন্ন দেশে লক্ষিত হইয়া একটি পরমাণু যে অন্যটির পরতন্ত্র, ইহা সহজেই প্রকাশ পাইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কোন এক ধ্বনির প্রবাহ আমাদের কর্ণ গোচর হইলে আমরা তাহাকে একটি ধ্বনি বলিয়া গ্রহণ করি; কিন্তু

সে ধ্বনি যে এক বস্তুর শক্তিতে অনেক ক্ষণ চলিতেছে, তাহা নহে; বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন শক্তিতেই উহা বহমান হইতেছে। বায়ুর অনেক হিল্লোল এ উহা-কর্ত্তৃক কর্ণ-কুহরে তাড়িত হইয়া তদীয় অনেক শক্তির ঘন ঘন অনুবর্ত্তন বশতই উহা প্রসূত হই-তেছে; পরন্তু উক্ত বিভিন্ন ক্রিয়া-সকলের মধ্যে কালচ্ছেদ এত অল্প যে বোধ হয় যেন একই স্বতন্ত্র বস্তুর শক্তিতে উল্লিখিত ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে।

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে বিষয়-সকল ইন্দ্রিয়-সকাশে যে রূপ আবির্ভূত হয়, তাহা উহারদের স্বরূপের অবিকল প্রতি-রূপ নহে। যেমন এক ব্যক্তি বাস্তবিক সাধু নহে—আপনাকে আপনি সাধু বলিয়া জানে না, অথচ সাধু সমাজে যথাসাধ্য সাধু-ভাব প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়; সেই রূপ বিষয় আপনাকে আপনি সত্য বলিয়া জানে না, অথচ বিষয়ীর সমক্ষে যথা সাধ্য সত্য-ভাব প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। বিষয়ের মায়া-জাল, বিষয়ের কৃত্রিমতা—এই প্রকার বচন-সকল পুরাতন কালা-বধি যাবতীয় তত্ত্ববিৎগণের গ্রন্থে বিশিষ্ট-রূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু আত্মারও যে ঐরূপ কৃত্রিমতা হইতে পারে, এবং ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয়—পরমাত্মারও যে ঐরূপ কৃত্রিমতা হইতে পারে; ইহা কেবল আধুনিক ইউরোপীয় তত্ত্ববিৎগণের গ্রন্থ মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু শেষোক্ত আশঙ্কা যে নি-তান্ত অমূলক তাহার আর সন্দেহ নাই; কারণ পরমাত্মা যখন সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন, তখন তিনি যে আপনাকে অসত্য-রূপে প্রকাশ করিবেন, ইহা ত একেবারেই অস-ম্ভব। এতদ্ব্যতীত—কোন মনুষ্যই জ্ঞান-সত্ত্বে আপনার নিকটে আপনি অসত্য-রূপে প্রকাশ পাইতে ইচ্ছা করে না, কেবল অজ্ঞতা বশতই মনুষ্য ওরূপ করিতে বাধ্য হয়। মনুষ্য আপনি এক রূপ হইয়া অন্যের নিকটে আর এক রূপ দেখাইলে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না বটে, কিন্তু আপনার নিকট হইতে আপনার স্বভাব ঐ রূপ গোপন রাখা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ইহা অস্বীকার করা যাইতেছে না যে, ব্যক্তি-বিশেষ বিষয়-মায়াজালে এ রূপ আচ্ছন্ন হইতে পারে যে সে অভিমান বশতঃ আপনি বাস্তবিক ক্ষুদ্র হইয়াও আপনাকে মহৎ মনে না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। এখানকার কেবল এই মাত্র তাৎপর্য্য যে আত্মা যে পরিমাণে স্বধর্ম্মানুযায়ী—অর্থাৎ উহা যে পরিমাণে জ্ঞানবান্ ও স্বাধীন—সেই পরি-মাণে উহা আপনার নিকটে যথার্থ রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে; কারণ আত্মা স্বাধীন-রূপে ও সজ্ঞান-রূপে কেন যে আপনাকে আপনি প্রতারিত করিবে, ইহার এক টুকুও অর্থ হইতে পারে না। আরো এই দেখা যায়, যে সাধু মহাত্মারা অন্যের নিকটেও আপনাদিগকে অসত্য রূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না, প্রত্যুত ইহাঁরা আপনার-দের পবিত্র অন্তঃকরণকে সাধারণ-সমক্ষে যথার্থ-রূপে প্রকাশ করিতেই সর্ব্বদা যত্ন পাইয়া থাকেন। ঈশ্বরের ভক্তেরাই যখন এই রূপ, তখন স্বয়ং ঈশ্বর আমারদের ক্ষুধিত আত্মা-সমক্ষে আপনাকে যে রূপ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ঠিক সত্য কেন না হইবে? অতএব ইন্দ্রিয়গণই মায়ার রাজ্য বা আবি-র্ভাবের রাজ্য, বুদ্ধি আপেক্ষিক সত্যের রাজ্য বা ভাব রাজ্য, প্রজ্ঞা পরম সত্যের রাজ্য বা প্রভাবের রাজ্য। ইন্দ্রিয়গণকে অবিশ্বাস করাই জ্ঞান-উপার্জ্জনের প্রথম সোপান; কেন না মায়াবী ইন্দ্রিয়গণের প্রতিকূলে

সংগ্রাম করিয়াই বুদ্ধি সত্য-রাজ্যে আপন অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। উদাহরণ—সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে না কিন্তু পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; দূরস্থিত নক্ষত্র-বিশেষ চক্ষুতে এক-সংখ্যক দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা দ্বিসংখ্যক; সূর্য্যের আলোক একই প্রকার দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক উহা সপ্ত প্রকার বর্ণের সংমিশ্র; মোহ বশত মনে হয় যে বিষয় স্বাধীন, আত্মা পরাধীন কিন্তু বাস্তবিক আত্মা স্বাধীন, বিষয় পরাধীন; এই রূপ আরো ভূরি ভূরি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এত ক্ষণ যাহা বলা হইল, ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইন্দ্রিয়গণ নিতান্তই অবিশ্বাসের পাত্র, বুদ্ধি কতক বিশ্বাসের যোগ্য ও প্রজ্ঞা সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য।

তৃতীয় প্রস্তাব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পষ্ট-রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে বুদ্ধি-চালনাতে আমারদের আপনারদেরই কর্তৃত্ব পরিস্ফুট হয়; এ ক্ষণে প্রজ্ঞাতে উক্ত কর্তৃত্বের যে রূপ অভাব বর্ত্তে তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে। আমারদের আপনারদের বলে সত্য জানাতে বুদ্ধির প্রভাব প্রকাশ পায়, পরন্তু সত্যের বলে সত্য জানাতেই প্রজ্ঞার প্রসাদ অভিব্যক্ত হয়। সত্যের বলে জানা, মঙ্গলের বলে কার্য্য করা, এবং সৌন্দর্য্যের বলে প্রীতি করা; এ তিনটি একই প্রকার উন্নত অবস্থার কার্য্য। সত্যে বিশ্বাস, সৌন্দর্য্যে অনুরাগ, এবং মঙ্গলে উৎসাহ; ইহাতেই প্রজ্ঞার প্রাধান্য, ইহাতেই মনুষ্যত্ব। নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য যখন আমারদের সম্মুখে, তখন কি আমরা যুক্তি ও কর্তৃত্ব পুরঃসর তাহাতে প্রীতি সমর্পণ করি? না আমাদের প্রীতি আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে? এই রূপ, অবিতথ সত্য যখন আমারদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে বিরাজ করে, তখন আমারদের বিশ্বাস আপনা হইতেই আবির্ভূত হয় এবং যখন অমায়িক মঙ্গল আমারদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আপনা হইতেই আমাদের উৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরমাত্মা আমারদের ব্যাকুলতা ও একান্ত আগ্রহ দেখিয়া এবং প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যখন কৃপা-পূর্ব্বক আপনাকে আমারদের নিকট পরিষ্কার-রূপে ব্যক্ত করেন, তখন আমারদের জ্ঞান প্রীতি কর্তৃত্ব ও সমুদায় মনের বৃত্তি যথোচিত চরিতার্থতা-পথে সহজেই ধাবমান হয় এবং তাহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি কৃতার্থ হই। আমারদের আপন কর্তৃত্ব যে রূপ বুদ্ধির প্রাণ, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সেই রূপ প্রজ্ঞার প্রাণ; ঈশ্বরের বাক্য-স্বরূপ প্রজ্ঞা-নিহিত সত্য-সকলে যদি আমারদের শ্রদ্ধার হানি হয়, তাহা হইলে কেবল তর্ক-মাত্রের বলে আমরা কখনই উহারদিগকে আয়ত্ত করিতে পারি না। যে ব্যক্তি বলে যে ঈশ্বর নাই, অথবা আমি নাই, অথবা বাহ্য বস্তু নাই; তাহার সহিত উক্ত সকল বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে গেলে অনর্থক বাক্য ব্যয় ভিন্ন আর কোন ফলই দর্শিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং আমারদিগকে বলিতেছেন যে "তুমি বাস্তবিক পদার্থ, মৃত্যুর হস্তেও তোমার বিনাশ নাই"—তাঁহার এ কথায় অবিশ্বাস করিয়া ফল কি? তিনি বলিতেছেন যে "সকলের উপরে আমি বিরাজমান আছি, সকলেতেই মঙ্গল হইবে, ভয় নাই"—ইহাতেই বা অবিশ্বাস করিয়া ফল কি? উক্ত সকল বাক্যের প্রতি বিশ্বাসের অধিকার যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কি বহুমূল্য নহে? তাহাতে কি আমারদের আত্মার তৃপ্তি হয় না? সত্যে বিশ্বাস না করিয়া অসত্যে বিশ্বাস করাই কি শ্রেয়? অতএব উক্ত প্রকার বিশ্বাস

কোন মতেই পরিত্যজনীয় নহে, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয় ;—"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু"। স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য-সকল যে নিতান্ত বিশ্বাস-যোগ্য ও সে বিশ্বাস যে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-সাপেক্ষ ; তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডীয় বিখ্যাত পণ্ডিত সর্ উইলিয়ম হামিল্টন এই রূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে "কতকগুলি সত্য, যাহাকে আমরা স্বতঃ-সিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা যখন আমরা বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি না; তখন তদ্বিষয়ে আমরা হাঁ কি না কোন কথা কহিবারই অধিকারী নহি"। এতদুপলক্ষে আমারদের বক্তব্য এই যে আমারদের বুদ্ধি উক্ত প্রকার সত্য-বিশেষকে সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করিতে পরাভব মানিলেও অমরা তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না এবং তাহাতে বিশ্বাস করিবার অধিকার আমারদের সম্পর্ণই আছে ও তাহাতে অবিশ্বাস করিবার লেশ মাত্রও অধিকার নাই। এতদ্বিরুদ্ধে কথিত মহাত্মার যুক্তি-প্রণালী এই রূপ ; যথা—আকাশ অসীম, ইহাও আমরা জানিতে পারি না ; আকাশ যে অসীম নহে, ইহাও আমরা জানিতে পারি না। ইহার প্রমাণ—আকাশকে আমরা যত পরিমাণ আয়ত বলিয়া জানিতে পারি, উহাকে তাহা হইতেও অধিক আয়ত বলিয়া না জানিলে উহাকে অসীম বলিয়া জানা হয় না ; এই রূপ আকাশের আয়তন আমারদের জ্ঞানের অতীত হওয়াতেই উহা অসীম রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং উহার অসীমতা জ্ঞান কর্ত্তৃক অবধারিত হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বলিতে পারা যায় না যে আকাশের সীমা আছে ; কেন না যদি বলা যায় যে আকাশ এই টুকু, তাহা হইলে উহা যে তাহা হইতেও আর একটুকু অধিক, ইহা বলিবার বাধা কি? অতএব ইহা যেমন জানিতে পারা যায় না যে আকাশ অসীম, ইহাও সেই রূপ জানিতে পারা যায় না যে আকাশের সীমা আছে। সর্ উইলিয়ম হামিল্টনের এই রূপ দ্বৈধ-জনক তর্ক বিতর্ক সত্য-জ্যোতিকে নির্ব্বাণ করিতে উদ্যত হইলেও সত্যজ্যোতি তাহাতে আন্দোলন পাইয়া যে আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, ইহা কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। সকল মনুষ্যই নিঃসংশয়-রূপে জানিতেছে যে আকাশ অসীম, কিন্তু আকাশ সসীম ইহা বিশ্বাস করিতে কেহই সমর্থ নহে ; এতদবস্থায় কোন্ বিচারে সিদ্ধ হইতে পারে যে আকাশের অসীমতা ও সসীমতা উভয়ই জ্ঞানের চক্ষে সম-দৃষ্টি-ভাজন? অতএব এ বিষয়ে আর অধিক বাক্য ব্যয়ের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি এ রূপ প্রশ্ন করা যায় যে আকাশের অসীমতা আমরা কি রূপে অবগত হই? তবে ইহার যথোচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক সত্ত্বে এ ক্ষণে তাহাই দেওয়া যাইতেছে। আমারদের জ্ঞান শরীর-পিঞ্জরে কিয়ৎ পরিমাণে আবদ্ধ হওয়াতে উহা সমুদায় আকাশকে সমান দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে না ; আপনার শরীরগত আকাশকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী মনে করে এবং তাহা হইতে যে আকাশ-খণ্ড যত বিচ্ছিন্ন, তাহাকে ততই দূরবর্ত্তী মনে করে; কিন্তু যদি আমারদের জ্ঞান কিছু মাত্র শরীর পরতন্ত্র না হইয়া ঐশ্বরিক জ্ঞানের ন্যায় সর্ব্বতো ভাবে বিশুদ্ধ হইত, তাহা হইলে অসীম আকাশকে আমরা একই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এক কালেই অবলোকন করিতাম, তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব ঈশ্ব-

রের নিরপেক্ষ ও অমায়িক জ্ঞানের প্রতি আমারদের বিশ্বাস অটল থাকাতেই তাঁহার সম-দৃষ্টি-ভাজন অসীম আকাশের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না—" জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে " " সর্ব্বত্র আছে গমন অথচ নাহি চরণ, কর বিনা করে গ্রহণ নয়ন বিনা সকল হেরে "। আমরা আপনারা যাহা জানি, তাহারই কেবল অস্তিত্ব আছে ও অন্য ব্যক্তি যাহা জানে তাহার অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ-স্থল—এ রূপ বলা যেমন স্পর্দ্ধা মাত্র ; আমরা আপনারা অসীম আকাশকে জ্ঞানে ধারণ করিতে পারি না বলিয়া, উহা আছে কি না সন্দেহ স্থল—এ উক্তিও সেই রূপ। কেন না উহাকে জ্ঞানে ধারণ করিতে আমরাই অশক্ত, ঈশ্বর কদাপি অশক্ত নহেন ; অতএব যদি ইহা স্বীকৃত হয় যে আমরা যাহা নাও জানি, তাহার অস্তিত্ব থাকিবার বাধা নাই এবং ঈশ্বর যাহা জানেন, তাহার অবশ্যই অস্তিত্ব আছে—তাহা হইলেই অসীম আকাশের অস্তিত্ব অটল রূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে, যে অসীম আকাশের অস্তিত্বে যথোচিত বিশ্বাস করিতে গেলে ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞানে বিশ্বাস করা অগ্রে আবশ্যক; পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মার প্রসাদেই আমরা অসীমের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি,নতুবা কেবল যুক্তি মাত্র দ্বারা আমরা কোন কালেই উক্ত ভাব উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতাম না। এই রূপ আমারদের আত্মা এবং বহির্ব্বস্তু-সকল অনন্ত কাল বর্ত্তিয়া থাকিবে—এ বিশ্বাসটিও অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-সাপেক্ষ এবং আর আর স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য-সম্বন্ধেও দেখান যাইতে পারে, যে পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস ব্যতিরেকে উহাদের বিশ্বসনীয়তা নিতান্তই অমূলক হইয়া পড়ে। পুনর্ব্বার এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ঈশ্বরের পূর্ণতা আমরা কি প্রকারে অবগত হই? ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে। আমরা যদি আপনার প্রতি পক্ষপাত-শূন্য হইয়া সত্যের প্রতি মন সমাধান করি,তাহা হইলে আমরা আপনারা যে কত অপূর্ণ তাহা একে বারেই আমারদের জ্ঞান গোচর হইবে; কেন? না—পূর্ণতার ভাব আদর্শ রূপে আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে স্বতই বিরাজমান রহিয়াছে ; এই মহান্ আদর্শের প্রতি যখন আমারদের দৃষ্টি যায়, তখন কাজেই আমারদের আপনারদিগকে তাহার তুলনায় অতীব অকিঞ্চন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। কেহ বলিলেও বলিতে পারেন যে পৃথিবীতে এ রূপ ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট সামগ্রী বিদ্যমান আছে, যাহার তুলনায় আপনাকে ঐ রূপ অকিঞ্চন মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ইহার উত্তর এই যে যখন আমরা নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক বহির্ব্বিষয়-সকল হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আপন আত্মার প্রতি প্রণিধান করি, তখনই আরো বিশিষ্ট-রূপে আপন প্রগাঢ় অকিঞ্চনতা আমারদের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে ; এবং যত কেন উৎকৃষ্ট বহু-মূল্য সামগ্রী সে অবস্থাগত উদাস অন্তঃকরণের সমীপবর্ত্তী হউক না, অমনি তাহার মূল্য একে বারে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া পড়ে। অতএব অন্য কোন কারণে নহে, কেবল এক পূর্ণতার ভাব আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে জাগরূক হওয়াতেই আমরা তাহার সমক্ষে হেঁট-মস্তক না হইয়া কোন রূপেই নিস্তার পাইতে পারি না। এই পূর্ণতার ভাবকে আমরা আপনারা ভাবিয়া চিন্তিয়া আনয়ন করি নাই, প্রত্যুত উহা আপনা হইতেই স্বীয় গুরু ভার ও স্বর্গীয় মহিমা সহকারে

অতীব শুভ ক্ষণে আমারদের আত্মাতে আসিয়া উদয় হয়। অতএব আমারদের এই অপূর্ণ আত্মা হইতে নহে—পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মা হইতেই পূর্ণতার ভাব অবতীর্ণ হইতেছে।

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে পূর্ণতার ভাব আমারদের বুদ্ধি দ্বারা কোন রূপেই প্রাপ্য নহে, অথচ প্রজ্ঞা উহার প্রতি নিঃসংশয় রূপে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে পারে না। এখানে পুনর্ব্বার এই একটি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে প্রজ্ঞা কেমন করিয়া বুদ্ধির অগম্য সত্যসকলকে উপলব্ধি করে? ইহারও উত্তর দেওয়া যাইতেছে।—বুদ্ধি-চালনার একটি প্রকরণ-পদ্ধতি আছে, কিন্তু প্রজ্ঞার সে রূপ কোন প্রকরণ নাই। বাস্তবিক সত্যসকলের দিকে বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয় বটে কিন্তু কোন কালেই উহা প্রকৃত গম্য স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, উহা কোন সত্যেরই শেষ পর্য্যন্ত পারদর্শী হইতে পারে না। পরন্তু প্রজ্ঞা বাস্তবিক সত্যে গিয়া একে বারেই পর্য্যস্ত হয়; বুদ্ধি এবং বুদ্ধির সিদ্ধান্ত এ দুয়ের মধ্যে যুক্তি-প্রকরণ-রূপ ব্যবধান অবস্থিতি করে কিন্তু প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞার সত্য এ দুয়ের মধ্যে কিছুই ব্যবধান নাই; সুতরাং বুদ্ধি-সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে উহা কি প্রকরণ দ্বারা সত্য উপলব্ধি করে, কিন্তু প্রজ্ঞা-সম্বন্ধে সে রূপ জিজ্ঞাসা নিতান্তই অর্থ-হীন। উদাহরণ—বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে জানিতে গেলে সে জানার কখনই শেষ হয় না, সুতরাং আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সুকঠিন হয়; "নেতি নেতি" ইহা নহে, ইহা নহে,—এই রূপ অশেষ প্রকরণ দ্বারা বুদ্ধি আত্মাকে ধরিতে যায়, কিন্তু কোন কালেই ধরিতে পারে না। অসীম আকাশকে বুদ্ধি যখন—ইহা নহে, ইহা হইতেও অধিক—তাহা নহে, তাহা হইতেও অধিক—এই রূপ নেতি নেতি প্রকরণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে যায়, তখনও উহা ঐরূপই পরাভব মানে। কিন্তু প্রজ্ঞা তর্ক বিতর্ক ও যুক্তি-রূপ প্রকরণ ব্যতিরেকেও একে বারেই জানিতেছে যে আমাদের জীবাত্মা আছে, অসীম আকাশ আছে, পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মা আছেন ইত্যাদি। অতএব যাঁহারা প্রজ্ঞার প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারদেরই মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় যে কি প্রকরণ দ্বারা প্রজ্ঞা পূর্ণ-স্বরূপকে উপলব্ধি করে? অন্যথা এ প্রশ্ন মূলেই উত্থাপনের সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধি-প্রকরণ দ্বারা সত্য উপার্জ্জন করাতে আমারদের আপনাদেরই কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়; কিন্তু কোন প্রকরণকে অপেক্ষা না করিয়া সত্যের বলে সত্যে প্রত্যয় করাতে সত্য-স্বরূপেরই কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। আমারদের আপন কর্ত্তৃত্ব যেমন বুদ্ধির প্রাণ, সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মে বিশ্বাস সেই রূপ প্রজ্ঞার প্রাণ। এই স্বাভাবিক বিশ্বাস, যাহা কোন প্রকরণ-পরতন্ত্র নহে, তাহাকে আত্ম-প্রত্যয় কহে, এবং বিনা প্রকরণে যে জ্ঞান আমারদের আত্মাতে আপনা আপনি আবির্ভূত হয়, তাহাই সহজ জ্ঞান শব্দে উক্ত হইয়াছে। সহজ শব্দের অর্থ সঙ্গে সঙ্গে জাত; আত্মা থাকিলেই যে জ্ঞান তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়, তাহাই সেই প্রজ্ঞা-মূলক সহজ জ্ঞান। এই আত্ম-প্রত্যয় এবং সহজ জ্ঞান সহকারেই প্রজ্ঞা, বুদ্ধির অপ্রাপ্য বাস্তবিক সত্য-সকলকে ঈশ্বর-প্রসাদে উপলব্ধি করিয়া থাকে; এবং প্রজ্ঞা যাহা বলে, তাহাতে বিশ্বাস ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই।

ধর্ম্মের আদর্শ।

সাধারণের সম্পূর্ণ আদর্শ কেবল এক মাত্র ঈশ্বর। যাহার অনুকরণ করিয়া চলিলে রাজা প্রজা-পালনে, অমাত্য মন্ত্রণা-দানে, আচার্য্য ধর্ম্মোপদেশে, পিতা মাতা পুত্র কন্যার প্রতিপালনে, দম্পতী পরস্পরের প্রেম বন্ধনে, পুত্র কন্যা পিতা মাতার শুশ্রূষায় সমর্থ হন, যাহার অনুকরণ করিয়া চলিলে সমুদায় লোক যথাযোগ্য রূপে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন করিতে পারে, তাহাই সম্পূর্ণ আদর্শ—সেই সম্পূর্ণ আদর্শ পরমেশ্বর। ঈশ্বর এই সংসাররূপ বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে মনুষ্যগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। তারাগণের ন্যায় অসংখ্য কার্য্যে কর্ম্ম-ক্ষেত্র পরিপূরিত আছে। রাজ্য শাসন অবধি ক্ষেত্র কর্ষণ পর্য্যন্ত সমুদায়ই তাঁহার কাজ। এক্ষণে মনুষ্যগণ যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আছে, চির কালই সেই রূপ বিচিত্র কার্য্যের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে, তাহাকে তদুপযোগী গুণ ও সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। কি অর্থ শাস্ত্র, কি বীর-কার্য্য, কি পরমার্থ তত্ত্ব, পৃথিবীতে সকল গুলিই আবশ্যক। সকলকেই ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া সাধ্যানুসারে ঐ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

এক মাত্র পূর্ণ-স্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই এ রূপ সম্পূর্ণ আদর্শ হইতে পারে না। ঈশ্বর জগতের রাজা—তিনি যে প্রকার ন্যায়ের সহিত অগণ্য প্রজাপুঞ্জের যথা-যোগ্য বিচার করিতেছেন, রাজা তাহার অনুকরণ করিলে পৃথিবীই স্বর্গধাম হয়। ঈশ্বর জগতের পিতা মাতা—তিনি যে প্রকার অটল স্নেহে সন্তানগণকে প্রতিপালন করিতেছেন, পিতা মাতা তাহার অনুকরণ করুন, সন্তানগণের অব্যাহত কল্যাণ উৎপন্ন হইবে। ঈশ্বর সকলের পরম গুরু—মানবগণকে শিক্ষা-দিবার নিমিত্ত তাঁহার যে প্রকার শিক্ষা-প্রণালী, আচার্য্যগণ সেই আদর্শ গ্রহণ করিলে পৃথিবীতে-শিক্ষা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। ক্ষমা ও দয়া সেই আদর্শ হইতে গ্রহণ করিলে মনুষ্যই দেব-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। অধিক কি, এমন একটি কর্ত্তব্যও নাই, যাহা সেই আদর্শ অনুসারে সুসম্পন্ন না হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই আদর্শ দর্শন করিয়াই সংকলিত হইয়াছে। মনুষ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে আপনার চরিত্রকে নির্ম্মিত করিবেন; মনুষ্যের চরিত্রকে আদর্শ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রস্তুত হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির জীবন ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী না হয়, তবে সেই মনুষ্যকেই দোষযুক্ত বোধ করিতে হইবে; কিন্তু কোন মনুষ্যের জীবন-চরিতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মিল হইতেছে না বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অযুক্ত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মকে আদর্শ করিয়া, আপনার জীবনকে শোধন করিতে পারিবেন, তিনি ইহ লোকেও মনুষ্যত্বের পরা কাষ্ঠা উপার্জ্জন করিবেন।

থিওডোর পার্কর।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬৫ পৃষ্ঠার পর।

ধর্ম্মের উপাদান মানব প্রকৃতিতে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। কি আন্তরিক নিরঙ্কুশ ইচ্ছা, কি বাহ্য অবস্থা, কি যুদ্ধ বিগ্রহ, কি শান্তি, কি স্বাধীনতা, কি দাসত্ব, কি অনভিজ্ঞতা, কি বিজ্ঞতা, কেহই ইহা উন্মূলিত ও বিধ্বস্ত করিতে পারে না। ইহার উন্নতির পথ প্রতিরুদ্ধ বা

উন্মুক্ত হইতে পারে; ইহার শক্তি বিপথে প্রবর্ত্তিত বা উপযুক্ত স্রোতে প্রবাহিত হইতে পারে; কিন্তু আন্তরিক ও বাহ্য কোন প্রকার বলই ইহার উপাদানকে এক-কালে বিনষ্ট করিতে পারে না। সুস্থ শরীর হইতে ক্ষুৎপিপাসা অপনীত করা যেমন সুকঠিন, আত্মা হইতে ধর্ম্ম-ভাব আচ্ছিন্ন করা সেই রূপ দুষ্কর। মনুষ্যের এই ভাবটি নিদ্রিত হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু ইহার বিনাশ একান্ত অসম্ভব। অদ্য কোন বাহ্য কারণে ইহা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে কিন্তু কল্য ইহা প্রজ্বলিত শিখাজাল বিস্তার পূর্ব্বক স্বর্গকে স্পর্শ করিবে। যখন এই ভাবটিকে ইহার প্রাকৃতিক গতি হইতে স্বতন্ত্র করা হয়, তখন ইহা অনিষ্টরাশি উৎপন্ন করিয়া বিনাশের পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়; তখনই আমরা ইহার ভয়-বিস্ময়কর নিগূঢ় শক্তির সম্যক্ পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। যাহারা ধর্ম্মের বন্ধনকে ঘৃণা করে, যাহারা ইহার বীর্য্য কিছুই জানে না, সেই সমস্ত ঘোর বিষয়ীরা মনুষ্য-রূপ উদ্যানের মধ্যস্থলে ঈশ্বরের স্বহস্ত রোপিত এই ধর্ম্মরূপ বৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না, প্রত্যুত এই জ্ঞানের ও জীবনের বৃক্ষ অক্ষুণ্ন ভাবেই অবস্থান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক নাম পরিগ্রহ করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে, তাহারাও অবিজ্ঞাত রূপে এই বৃক্ষের সুপ্রশস্ত ছায়ায় বিশ্রাম ও ইহার সুস্বাদু ফলে তৃপ্তিসুখ অনুভব করিয়া থাকে। ধর্ম্ম অনুগত ব্যক্তিকেই সুখিত করে। যে ব্যক্তি ঐশিক নিয়মের বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া হৃদয় হইতে ধর্ম্ম ভাব উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাকে যার পর নাই মর্ম্মভেদী যাতনা অনুভব করিতে হয় সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম-ভাব মানব প্রকৃতিতে একটি সুদৃঢ় ও গভীর উপাদান স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা কোন সমাজিক নিয়ম ও কল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে না। ইহা প্রত্যেক মনুষ্যে তুল্য-রূপে বিদ্যমান আছে। যদিও ইহার পরিমাণ-গত বৈলক্ষণ্য যায়, কিন্তু প্রত্যেক আত্মাতেই ইহার প্রকৃতি একই প্রকার লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মনুষ্যের অতি গভীর অন্তর হইতেই পূজা প্রার্থনা ও স্তুতিগীত নিঃসৃত হয়। ধর্ম্ম যে কত দূর স্থান অধিকার করিয়া আছে, পৃথিবীর ইতিবৃত্তই তাহা এক প্রকার সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। ধর্ম্ম শিল্প ও পদার্থ বিদ্যার প্রসূতি; অতি-ভীষণ সংগ্রামের উপরও ধর্ম্মের শাসন নিরীক্ষিত হয়। ধর্ম্মই অদৃশ্য হস্তে সমস্ত লোককে ধারণ করিয়া আছে। ব্যবস্থাপকদিগের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা প্রণালী অপেক্ষাও ইহা অপ্রতিহত বলে মনুষ্যদিগের আন্তরিক দুর্দ্দান্ত রিপুগণকে দমন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা মনুষ্যের সৎ প্রবৃত্তি সমুদায়কে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। সন্তাপহর সন্তোষ প্রেরণ করিয়া দুঃখ সমুদায় প্রশমিত করিতেছে, এবং দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য হইতেও একটি বিশ্বাস প্রেরণ করিয়া ভবিষ্যৎ আশা উজ্জ্বল করিতেছে।

ধর্ম্মই সমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যবস্থাপক ও শিল্পিদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে উত্তেজিত করিতেছে। ইহাই পূর্ব্বতন বীরগণকে সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিল। সাহস ও সহিষ্ণুতা ধর্ম্মেরই পবিত্র আদেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে পণ্ডিতেরাও একটি নগর প্রস্তুত করিতে পারেন না কিন্তু ধর্ম্মের সাহায্য লাভ করিয়া এক জন নির্ব্বোধ বাতুলও বহুসংখ্য লোককে শাসন করিতে পারে।

অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্য সমুদায় ধর্ম্মের উৎসাহজনক বাক্যে সংসাধিত হইয়া থাকে। সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য প্রস্তরও ধর্ম্মের মুগ্ধকর করস্পর্শে সমুন্নত হয় এবং উহা যেন যথার্থই পবিত্র জীবন বহন করিতেছে ইহা বোধ হইয়া থাকে। দেবতার একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে দেখিলে ইহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় যেন সে নিস্তব্ধ ও জীবন্তভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উপাসক দিগের প্রার্থনা ও স্তুতিগান শ্রবণ করিতেছে; শিল্পবিদ্যা ধর্ম্মকেই মন্দির ভজনালয় যজ্ঞবেদি যূপ ও দেব প্রতিমা প্রভৃতি উপহার প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা জড় বস্তুকে পবিত্র আকারে পরিণত করে, যাহারা সারবৎ কঠিন দ্রব্যকে আপনার আয়ত্ত করিয়া মঠ প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে, যাহারা প্রস্তর দ্বারা আপনা দিগের ইচ্ছাকে জীবন্ত করিতে সমর্থ হয়, সেই সমস্ত ব্যক্তি কাহার নিকট হইতে এই রূপ উদ্ভাবনী শক্তি প্রাপ্ত হইল? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ধর্ম্মই উহাদিগকে এই রূপ অদ্ভুত শক্তি প্রদান করিয়াছে। উহারা ধর্ম্মের উৎসাহেই এই সমস্ত বিস্ময়কর পদার্থ প্রস্তুত করিতেছে। মনুষ্যের আদিমাবস্থায় অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য হইতেও ধর্ম্মের আদেশে মনুষ্যের প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল, দেবতাদিগের উদ্দেশে নানা প্রকার উপাখ্যান ও গান প্রস্তুত হইত এবং কৃতজ্ঞতা অনুতাপ ও প্রার্থনা-পূর্ণ গাথা সকল লোকের স্মৃতি-পথে জাগরূক থাকিত। ধর্ম্ম-বিরহে মনুষ্য গ্রাম, নগর ও গৃহ সমুদায় প্রস্তুত করিতে পারিত না, অন্ধকারের নিমিত্ত আলোক ও শীত নিবারণের নিমিত্ত বস্ত্রও প্রাপ্ত হইত না। ধর্ম্ম-বিরহে কোন জাতিই অবস্থান করিতে পারে না। সহস্র সহস্র মনুষ্য ধর্ম্মের নিমিত্তই দার পরিগ্রহ না করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে দেখিয়া কি কেহ এই রূপ কহিতে পারেন যে তাহারা সম্পদ সুখ ও যশোলাভার্থে এই রূপ অনুষ্ঠান করিতেছে?

মনুষ্য ধর্ম্মের অনুরোধেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। মনুষ্য সুখ শান্তি, জনসমাজ, বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি যা কিছু প্রীতিকর বলিয়া বিবেচনা করে, ধর্ম্মের নিমিত্ত তৎসমুদায়ই পরিত্যাগ করিতে পারে। যদি ধর্ম্মের স্বর শ্রুতিগোচর হয়, তাহা হইলে কোন বিপদকেই বিপদ ও কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া বোধ হয় না। সাইমিয়ন বহু কালই স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দেশে আপনাদিগের দেহের মাংস ছেদন করিবে। ধর্ম্মার্থই পেগান পৌত্তলিকেরা প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির সন্নিধানে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আপনার অধিকৃত বস্তু সমুদায় প্রদান, অতি জঘন্য ব্রতাদি সংসাধন ও আপনার অঙ্গ বিশেষ ছেদন করিয়া থাকে। আত্মার পাপ শান্তির নিমিত্ত আপনার প্রথম সন্তানকে প্রদান করে এবং আপনার শরীরকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই রূপ ত্যাগ স্বীকার করিলে দেবগণ প্রীত ও প্রসন্ন হইবেন, এই প্রকার বিশ্বাস করিয়াই তাহারা এই সমস্ত দুষ্কর কার্য্য অনুষ্ঠান করে। খ্রিষ্টীয় পৌত্তলিকেরা ভ্রান্তি সংকুল মতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সামান্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম বুদ্ধিকে ঐ রূপ কল্পিত শাসনের হস্তে সমর্পণ করে, অলীক অমূলক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনে প্রস্তুত হয়, অসঙ্গত বাক্য আদরের সহিত প্রতিগ্রহ করে এবং যাহা ধর্ম্ম বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত তাহার অনু-

ষ্ঠানে তৎপর হয়। যাহা মনুষ্যের জীবনকে ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে; অনন্ত কালকে ভয়ঙ্কর, মনুষ্যকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় নিকৃষ্ট ও ঈশ্বরকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে এবং যাহার প্রভাবে খ্রিষ্টধর্ম্ম বিরোধী অর্দ্ধেক মনুষ্যকে অভিশপ্ত বলিয়া স্থির করিতে হয়, এই পৌত্তলিক সম্প্রদায়েরা সেই মতেই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই অসঙ্গত বিশ্বাসের কারণ অনুসন্ধান করিলে তাঁহারা কহেন যে ধর্ম্মের অনুরোধে এই রূপ বিশ্বাস করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। যখন দুষ্ট পুরোহিত অস্পষ্ট বাক্যে লাটিনভাষায় কূটার্থ পূর্ণ মন্ত্র পাঠ ও কর-যুগল উত্তোলন করেন, তখন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন টমাস মুরও ধর্ম্মের অনুরোধে এক খণ্ড রুটিকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রীতিকর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এখনও টমাস মূরের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকেও ধর্ম্মের আদেশ ও ঈশ্বরের নির্দ্দেশ বলিয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত মতের একান্ত পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। ধর্ম্মের নিমিত্ত অযৌক্তিক উপদেশও মনুষ্যের গ্রাহ্য হইয়া থাকে; ঘৃণিত ও দূষিত মত, নিকৃষ্ট আচার ব্যবহার এবং অনুপেক্ষণীয় দোষ সমুদায় ধর্ম্মের প্রভাবেই সুন্দর, মনোহর, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও ঈশ্বর পরিগৃহীত বলিয়া বিবেচিত হয়। দুরাচার পামরেরা পাপাত্মা নরাধমকেও আশীর্ব্বাদ ও ধর্ম্মপরায়ণ পবিত্র ব্যক্তিদিগকেও অভিশাপ প্রদান করিতে পারে এবং যোগিগণ আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ উভয়েতেই হস্তোত্তোলন করিতে সমর্থ হয়।

কাহার শাসনে এই সমস্ত কুৎসিত বিষয় এবং ঈশ্বরের অকীর্ত্তিকর দূষিত মত সমুদায় লোকের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে? কাহার নিমিত্ত মনুষ্যেরা এই সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান ও এই রূপ দুষ্কর ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। ধর্ম্মের জন্যই রাজা, অমাত্য, প্রধান পদস্থ ও উন্নতমনস্ক মনুষ্যেরা আপনাদিগের সুগভীর বিচার শক্তিকে বিসর্জ্জন ও জ্ঞান চক্ষুকে মুদ্রিত করে এবং যাহারা ভণ্ডতা ও কপটাচার বৈ আর কিছুই জানে না, সেই সমস্ত হতভাগ্য নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের চরণে প্রণত হয়। আদি ভবিষ্যদ্বক্তার সময় অবধি এখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জন্য এই রূপ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধির গৌরব, জ্ঞানের প্রাধান্য, ধর্ম্ম বুদ্ধির উৎকর্ষ এবং প্রীতি ও বিশ্বাসের সৌন্দর্য্য অপহৃত ও পদতলে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। কর চরণ চক্ষু কর্ণ ও জিহ্বা প্রভৃতি বিশুদ্ধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিচারশক্তি, কল্পনা শক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তি, দয়া ন্যায় পরতা ও প্রীতি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমুদায়কে অপবিত্র বস্তুর ন্যায় ঈশ্বরের পবিত্র ক্ষেত্রে বলিপ্রদান করা হইয়াছে। কি পৌত্তলিক কি খ্রিষ্টসন্ন্যাসী কি বিদ্যাবিশারদ মনীষী কি সুসভ্য মনুষ্য সকলকেই এই রূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই শোকাবহ ফল-সকল ধর্ম্ম ভাবের ভ্রান্তিও মনুষ্যের বিকৃতি বলিয়া নির্দিষ্ট হয়; কিন্তু ইহা ধর্ম্মের সহিত জড়িত এবং ধর্ম্মের প্রকৃত ফল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই অনেকের এই রূপ একটি সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ধর্ম্ম একটি ভয়ঙ্কর পদার্থ এবং উহা মনুষ্যের মূর্খতা ও বাতুলতা। ফলত এই রূপ বিষদৃশ ফল ধর্ম্মকে অন্য প্রকারে প্রতিপাদন করিতেছে। এই সকল ফল দ্বারাই যাহা মনুষ্যের ক্রোধাদি রিপু, ধর্ম্মবুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রীতির উপর আধিপত্য করে, সেই ধর্ম্মভাবের গাম্ভীর্য্য ও ভয়-বিস্ময়-কর বলবীর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয়

প্রদত্ত হইতেছে। যদি এক জন মনুষ্যকে এই বলিয়া প্রলোভিত করা যায় যে সে জীবন পরিত্যাগ করিলে তাহার কোন স্বার্থ সাধন হইতে পারে, তখন সংশয় উপস্থিত হইয়া তাহার চিত্তকে আন্দোলিত করে, কিন্তু যদি তাহাকে বলা যায় যে তুমি ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ কর, ধর্ম্ম তোমার নিকট এই রূপ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তখন কেবল সেই ব্যক্তি নহে, সহস্র সহস্র লোক আনন্দের সহিত উৎসাহের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে। ধর্ম্ম একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ; এই ধর্ম্মই নিকৃষ্ট ব্যবহারে পরিণত হয় কিন্তু আবার সেই নিকৃষ্ট ব্যবহারই ইহার মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়।

নূতন পুস্তক।

১। চিত্তোৎকর্ষ বিধানং। এই পুস্তক খানি সংস্কৃত পদ্যে বিরচিত। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস অধিকারী ওয়াট্ সাহেবের ইম্প্রুবমেন্ট অব মাইণ্ড্ নামক পুস্তকের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থকার প্রথম পরিচ্ছেদে ভূমিকা দ্বারা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়া গ্রন্থারম্ভে চিত্তোৎকর্ষ বিধানের পঞ্চদশ প্রকার নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দর্শন, অধ্যয়ন, উপদেশ গ্রহণ, আলাপ ও চিন্তা, চিত্তোৎকর্ষ বিধানের এই পাঁচ প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ ও গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে মূল পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার বিষয় সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অনুবাদিত গ্রন্থ তাদৃশ প্রাঞ্জল হয় নাই। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে বোধ হইল, গ্রন্থকার এতদ্দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে সংস্কৃত ভাষা দ্বারা নূতন জ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কত দূর কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না। গ্রন্থকার এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, "মানবপ্রকৃতেভূর্রিদোষদৌর্ব্বল্যবিভ্রমাঃ। আদিস্বধর্ম্মবিভ্রংশরূপপাতিত্যসম্ভবাঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রথমে মনুষ্যের একটি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ছিল, মনুষ্য সেই আদি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; সেই পাতিত্য নিবন্ধন মানব প্রকৃতিতে অনেক দোষ, ক্ষীণতা ও ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় মত এবং সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গ্রন্থকার যদি এই ভাবটি উঠাইয়া দিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হইত না এবং ইহার গৌরবও সমধিক হইত। তিনি যদি কেবল খৃষ্টানদিগের নিমিত্ত ইহার অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে হানি ছিল না। এতদ্দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা খৃষ্টীয় ভাবগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি ইহার যথার্থ হিতকারী বিষয় গুলি শিক্ষা করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

২। আঞ্জমনি-পঞ্জাবের বিবরণ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি পঞ্জাবে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য দুই প্রকার। প্রথম সংস্কৃত ও আরবি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার পুনর্জীবন প্রদান, দ্বিতীয় তৎপ্রদেশস্থ সমস্ত লোকের নিকট পারস্য, হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় বিবিধ জ্ঞানের শিক্ষা দান। এই বিবরণ পুস্তকে ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় তাহার উপায় ও নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, পঞ্জাব দিন দিন উন্নত হইতেছে।

(FROM THE ENGLISMAN.)

To make up the present of all nations there must be a past. The present, to use the words of the late Prince Consort in his address to the British Association, stands on the shoulders of the past; and if so, upon the shoulders of what Past shall we build the present of India? Upon the past of Egypt, Babylonia, Assyria, Persia, Greece, Rome, Germany,

France, England, or any other modernly civilized nation of the world, or upon the past of India herself? Surely, if ever there was a country, the Past of which is interesting and instructive to the student of history, that country is India. What! exclude from the course of an *Indian* University, the ancient history of that people, who, issuing from our common home, established in a remote land, a civilization, unique in itself, which penetrated as far as Egypt and beyond it; forbid its students to recal that period when, all Europe, but a little spot, being sunk in barbarism, Alexander the Great, if the records of Megasthenes and Strabo are to be believed, found in India schools of philosophers whose whole life was devoted to the study of the sublimest transcendentalism, the profoundest of all knowledge,—the knowledge of the soul? Shall we hide from our native students our own belief in the superiority of the race from which they have sprung,—that race who, having settled amongst savage tribes, reduced rude societies to order, invented letters, and elaborating a wonderously perfect language, laid the very foundations, we may say, of the highest order of philology, who, having similarly invented numbers, unaided, but by the force of their natural genius, advance to arithmetic and astronomy, calculated eclipses, and made other accurate astronomical observations? Are we to hold back from those, we fain would elevate, the knowledge that, when all was chaos in Northern Europe, their forefathers had established systems of law, logic, and mental and moral philosophy, which, if at the present day they are considered eccentric, prove them, nevertheless, to be capable of, and at one time to have attained, the very highest mental culture, and then to have been possessed of an original, and not a purely imitative genius? Are the names of Manu, Yajnavulkya, Parasara, Viswamitra, Sakya Muni, Kapila, Saunaka, Katyayana, Panini, Kalidasa, Vyasa, Valmiki, and whole host of others we might mention, to be proscribed, and their great works to be held up to public scorn, or, so to speak, to be burned by the common hangman? Or to take a nearer retrospect, is that Oriental link to be cut out of the chain which connects the civilization of our own times with that of Ancient Greece? Is it from the pages of Chaucer alone, that the students of an Eastern University are to learn that in *his* day knowledge in England, as in the rest of Europe, was sought from

> ——————olde Esculapius,
> And Discorides, and eeke Rufus;
> Old Ypocras, Haly, and Galien;
> Serapyon, Razis, and Avycen;
> Averrois, Damescen, and Constantyn;
> Bernard, and Gatisden, and Gilbertyn?

Are our students to be permitted to read in Elphinstone, Mill, Elliot and others, or in the proceedings of the Asiatic Society, of the foundation of mighty empires, the building of temples, the endowment of colleges, schools, and charitable institutions, the encouragement of learning and men of letters, by the mighty sovereigns who have ruled over this land; to see around them the ruins of canals, roads, fortresses, mosques, and mausolums of the most exquisite architecture, and exhibiting a highly, refined state, and to compare them with that monument of empty bottles which it was said, and a very few years back might very justly be said, was all we should leave behind us;—to hear that such men as Sir William Jones, James Prinsep, Sir W. Macnaghten, Colebrooke, H. H. Wilson, Sir Henry Elliot, and the few scholars British India has produced, attained a European celebrity from their profound knowledge of the Past, and yet be expected to believe that that Past is 'unmixed evil.' In short, having eyes shall they see not, ears shall they hear not, and understanding shall they be dead to those impulses which, be they of creed, of nation, or of race, nature has implanted in the hearts of all it has endowed with superior intelligence. Impossible! Yet such would really appear to be the visionary idea of the authorities of our chief Educational Institution. The past of India, her mythology, her religions, her laws, her ancient languages, her literature with its dramas and epics, her logic, her antiquities, have all been carefully excluded from the Calcutta University system; and, whichever way we view it, what a melancholy parody on that system is it, that before the close of the first decade of the Institution's existence, the Vice-Chancellor has thought it necessary to devote a third of his annual address to a vain endeavour to wean the students from dwelling on that period of their country's history which is said to be "unmixed evil." And why is this?

Why, we would ask, whether the past of India be good or evil, should the sons of her soil be warned against a practice which, from time immemorial, the natives of all countries have considered one of their dearest privileges? Why again should it be deleterious? Or, admitting for argument sake, the past of India to be all evil, and the present all good, why should any one, having full confidence in the latter, dread a comparison with the former, however, highly that comparison might be colored? We really can see no reason for it; but on the contrary, every reason why such comparison should be encouraged to the utmost, as the surest means of making the students appreciate those great advantages which they are told they enjoy under British rule.

But a question arises on the threshold of this argument, and of all similar arguments, in which the premises are not demonstrable facts or admitted truths,—is the conclusion true? Is the past of India unmixed evil? With the most convincing of proofs of the high place in the intellectual history of the world which Ancient India has a right to claim, furnished by early Greek Historians, proofs which Europeans Savans have verified and increased manifold, and with the institutes of Akbar before us—to which as the Government of India are now defraying the expenses of a new edition, they would probably not be ashamed to own their obligations,—we think we may spare ourselves the trouble of advancing further evidence to prove the negative of so novel a proposition. The past of India may be singular according to our notions, and, as with the past of all nations which recede into very remote antiquity, it may contain much that is repugnant to modern ideas of civilization, but, most certainly, no one with any but a very superficial knowledge of that past could be so bold or so rash as to pronounce it unmixed evil. Indeed, could Dr. Maine succeed in establishing the affirmative of his proposition, we fear that it would prove too much; for, were it so, it would be impossible to find a circumstance more condemnatory of the present system than that those brought up under it, preferred to look back with longing eyes to those evil times, than to the bright prospect which they are confidently assured, lies before them. Depend upon it, when such is the case, there must be something much more wrong with the present than with the past, and that the fault lies not with the students, or in the practice by them of any modern tricks they may have picked up from their European instructors, but that the evil has deeper roots. Depend upon it the Natives of this or any other country will not withdraw their thoughts from the present to dwell with satisfaction or pride on the past, or to yearn after its imaginary blessings, unless they feel some real want which the present does not supply. The learned doctor, it appears to us, has overlooked—possibly rather looked over—the true cause of discontent which finds expression in regrets for the past, if it really exist. The educated natives of this country if we understand their views rightly have no desire whatever to be astrologers, poets, or chroniclers to mythical Indian Princes of ancient memory, nor do they spend much of their time in comparing the briliancy of the career of learned men in ancient and modern India. Taking them at Dr. Maine's high valuation, they are far too astute and far too sensibly alive to their own interests, to have any such silly notions. What they deplore is, that the real Indian Kings, Viceroys, and Princes of British India, have no astrnomers, poets, or historians, attached to their Courts; and that, conseqently, there are *no* learned men in India. In other words, learning is not encouraged— there is no demand for it, and consequently, it is not produced. Under Mahomedan rule there was always a large literary class, scattered throughout India. The last vestiges of this class still exist, but they are reduced in circumstances, and are scattered so far and wide that they may almost be said to have disappeared. The class can obtain no fresh blood, or new life because for a man to devote himself to any kind of learning now, is to make mendicity his profession, or to starve. The class therefore, and, with it, all learning, is dying out. This very probably is what the educated Natives feel; and it is with this very natural feeling, no doubt, which Sir Donald McLeod, and many who coincide with him in his views regarding the present system of exotic education, have very great sympathy.

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে দুর্ভিক্ষ উপশমের নিমিত্ত কটক ব্রাহ্মসমাজে ২৫০ ও মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে ২০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব বারে কটক প্রদেশের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সংপ্রতি মেদিনীপুরের সংবাদ পাওয়াগিয়াছে। তথায় প্রতি দিন ৮০ জন করিয়া আহার প্রাপ্ত হইতেছে। তথাকার সমাজের অধ্যক্ষেরা বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই টাকায় প্রায় ৩ মাস এই রূপ সাহায্য করা যাইতে পারিবে।

দুর্ভিক্ষ উপশমের সাহায্যার্থ
দান প্রাপ্ত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত		৪৯৭।৶০
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৩৬৶০	
" গিরীন্দ্রনাথ সিংহ	১	
		৩৭ ৶০
		৫৩৪॥৵০

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের শ্রাবণ মাসের
আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা	১২০৸৶০
পুস্তকালয়	৯৩ (১০
যন্ত্রালয়	৩৩০৸০
ডাক মাসুল	২৫।৶০
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	৩৭ ৶০
রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পত্তি হইতে দান প্রাপ্ত	২৮
গচ্ছিত	৬৪৸৴০
	৭০৩৵১০

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৬৪ (৫
যন্ত্রালয়	১২১৶১০
পুস্তকালয়	৯১॥৴১০
মাসিক বেতন	১০৭
ডাক মাসুল	২৪॥১০
অনিরূপিত	৯।৴৫
আলোকের ব্যয় (জুন ও জুলাই ২মাসে)	৪১।৵৫
কাগজ পত্রাদি	৬৸৶০
গচ্ছিত	৮৭॥৶০
	৬৫৩॥৶৫

আয়	৭০৩৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৭১॥৴০
	৮৭৪॥৶১০
ব্যয়	৬৫৩॥৶৫
স্থিত	২২১(৫

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক

১৭৮৮ শকের শ্রাবণ মাসের দানের
আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় .. ১৬

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০

৩৬

আয়	৩৬
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৮৯৸০
	১২৫৸০

ব্যয়

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে দান	১০
	১১৫৸০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১ আশ্বিন রবিবার প্রাতঃকালে ৭॥০ সাড়ে সাত ঘন্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা।
সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ১২ ভাদ্র সোমবার।

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
২৭৮ সংখ্যা। আশ্বিন ১৭৮৮ শক। ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
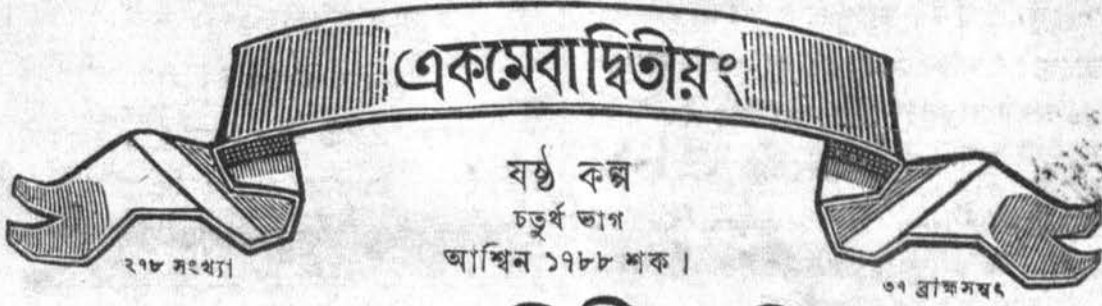
ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে দশমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৮৫

১। অসা॑বি॒ সোম॑ ইন্দ্র তে॒ শ-বি॑ষ্ঠ ধৃষ্ণ॒বা গ॑হি। আ ত্বা॑ পৃণ-ক্ত্বিন্দ্রি॒য়ং রজ॒ঃ সূর্য্যো॒ ন র॒-শ্মিভি॑ঃ।

১। হে 'ইন্দ্র' 'তে' ত্বদর্থং 'সোমঃ' 'অসাবি' অভিযুতোঽভূৎ। হে 'শবিষ্ঠ' অতিশয়েন বলবন্ অতএব 'ধৃষ্ণো' শত্রূণাং ধর্ষয়িতঃ ইন্দ্র 'আগহি' দেবযজনদেশং আগচ্ছ। আগতং 'ত্বাং' 'ইন্দ্রিয়ং' সোমপানেনোৎপন্নং প্রভূতং সামর্থ্যং 'আপৃণক্তু' আপূরয়তু। 'রজঃ' অন্তরীক্ষং 'রশ্মিভিঃ' কিরণৈঃ 'সূর্য্যঃ' 'ন' যথা সূর্য্যঃ পূরয়তি তদ্বৎ।

১। হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত সোমরস সংস্কৃত হইয়াছে। হে মহাবল! হে শত্রু-বিনাশন! তুমি এই দেবযজন প্রদেশে আগমন কর। যেমন দিবাকর কর-নিকর দ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন, সেই রূপ সোম-রস-পানোৎপন্ন সামর্থ্য তোমাকে পূর্ণ করুক।

৮৮৬

২। ইন্দ্র॒মিদ্ধরী॑ বহ॒তোঽপ্র॑-তিধৃষ্ট শবসং। ঋষী॑ণাং চ স্তু॒-তীরুপ॑ য॒জ্ঞং চ॒ মানু॑ষাণাং।

২। 'অপ্রতিধৃষ্টশবসং' কেনাপ্যপ্রাধর্ষিতবলং অহিংসিতবলমিত্যর্থঃ। 'ইন্দ্রং' 'ইৎ' ইন্দ্রমেব 'ঋষীণাং' বশিষ্ঠাদীনাং 'মানুষাণাং' চ 'স্তুতিঃ' 'যজ্ঞং' 'চ' 'হরী' অশ্বৌ 'উপবহতঃ' সমীপং প্রাপয়তঃ। যত্র যত্র স্তুবন্তি যত্র যত্র যজন্তে তত্র সর্ব্বত্রেন্দ্রমশ্বৌ প্রাপয়ত ইত্যর্থঃ।

২। যেস্থলে মনুষ্যেরা স্তব ও মহর্ষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় অশ্বদ্বয় সেই অধৃষ্য-বল ইন্দ্রকে লইয়া যাউক।

৮৮৭

৩। আ তি॑ষ্ঠ বৃত্রহ॒ন্রথং॑ যু॒ক্তা তে॒ ব্রহ্ম॑ণা॒ হরী॑। অ॒র্বাচী॒নং সু তে॒ মনো॒ গ্রাবা॑ কৃণোতু ব॒গ্নুনা॑।

৩। হে 'বৃত্রহন্' শত্রূণাং হন্তরিন্দ্র 'রথং' 'আতিষ্ঠ' আরোহ। যস্মাৎ 'তে' 'হরী' ত্বদীয়ৌ অশ্বৌ 'ব্রহ্মণা' স্তোত্রলক্ষণেন মন্ত্রেণ 'যুক্তা' রথে অস্মাভির্যোজিতৌ। তস্মাৎ ত্বং রথং আতিষ্ঠ। 'তে' 'মনঃ' ত্বদীয়ং মনশ্চ 'গ্রাবা' অভিষবার্থং প্রবৃত্তঃ পাষাণঃ 'বগ্নুনা, বচনীয়েনাভিষবশব্দেন 'অর্ব্বাচীনং' অস্মদভিমুখং 'সু' 'কৃণোতু' সুষ্ঠু করোতু।

৩। হে শত্রু-সংহারক ইন্দ্র! তোমার অশ্বদ্বয় ব্রহ্ম মন্ত্র দ্বারা রথে সংযোজিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি রথে আরোহণ কর। কণ্ডনী শিলা অভিষব শব্দ দ্বারা তোমার মনকে আমাদিগের অভি মুখীন করিয়া দিক।

৮৮৮

৪। ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্ত্যং মদং। শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ধারা ঋতস্য সাদনে।

৪ হে 'ইন্দ্র' 'সুতং' অভিষুতং 'ইমং' সোমং 'পিব' কীদৃশং 'জ্যেষ্ঠং' অতিশযেন প্রশস্যং 'মদং' মদকরং 'অমর্ত্ত্যং' অমারকং সোমপানজন্যোমদোমদাস্তরমন্মারকো ন ভবতীত্যর্থঃ। তথা 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি 'সদনে' গৃহে বর্ত্তমানাঃ 'শুক্রস্য' দীপ্তস্য অস্য সোমস্য 'ধারাঃ' ত্বাং 'অভ্যক্ষরন্' আভিমুখ্যেন সংচলন্তি। ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি। স্বযমেবাগচ্ছন্তীত্যর্থঃ।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি এই সংস্কৃত অতিশয় প্রশংসনীয় ও মাদক অথচ অমারক সোম রস পান কর। এই যজ্ঞগৃহে বর্ত্তমান অতি উজ্জ্বল সোমরসের প্রবাহ তোমার নিকট গমন করিতেছে।

৮৮৯

৫। ইন্দ্রায নূনমর্চতোক্থানি চ ব্রবীতন। সুতা অমৎসুরিন্দবো জ্যেষ্ঠং নমস্যতা সহঃ। ১। ৬। ৫।

৫। হে ঋত্বিজঃ 'ইন্দ্রায' 'নূনং' ক্ষিপ্রং 'অর্চ্চত' পূজনং কুরুত। এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে। 'উক্থানি' অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যানি স্তোত্রাণি 'চ' 'ব্রবীতন' ব্রূত। 'সুতা' অভিষুতা 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'আমৎসু' আগতমেব তমিন্দ্রং মত্তং কুর্ব্বন্তু। অনন্তরং 'জ্যেষ্ঠং' প্রশস্যতমং 'সহঃ' সহস্বিনং বলবন্তং তং ইন্দ্রং 'নমস্যত' নমস্কুর্ব্বত। ১। ৬। ৫।

৫। হে ঋত্বিকগণ! তোমরা ইন্দ্রকে অবিলম্বে অর্চ্চনা ও স্তোত্র দ্বারা আরাধনা কর। সংস্কৃত সোম রস ইহাঁকে আনন্দিত করুক। তৎপরে তোমরা এই প্রশংসনীয় বীরকে নমস্কার কর। ১। ৬। ৫।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৪ ভাদ্র রবিবার ১৭৮৮ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

আমরা একটি ক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র—একটি কণা মাত্র। অসীম সংসার মধ্যে আমরা প্রতি জনে একটি ক্ষুদ্র বালুকা-রেণু তুল্য। যখনি আমরা তাঁহার পথের দ্বারে উপস্থিত হই, তখনি আমারদের মহত্ত্ব—তখনি আমারদের আনন্দ। যখন উর্দ্ধগামী এক বিন্দু বালু-কণাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, তখন তাহা সম্পূর্ণ সূর্য্যকে প্রতিবিম্বিত করে—আবার তাহা ভুমিসাৎ হইলে ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া পূর্ব্ববৎ মলিন হইয়া যায়। সেই প্রকার আমারদের আত্মা সংসারের ঘোরে বদ্ধ থাকিলে তাহার মলিনতা বৃদ্ধি পায়—যখন সেই আত্মা পরমাত্মার কিরণ প্রতিবিম্বিত করে; তখন সে উচ্চ হয়, তখন তাহার সুন্দর ভাব সকলের নিকটে প্রকাশ পায়। আমারদের আত্মা ক্ষুদ্র হইয়াও যখন তাঁহার পথের দ্বারে যায়, তখনি তার মহত্ত্ব। তাহা হইতে ছাড়া হইলে আমারদের সকলি দুর্গতি। যে সময়ে তাঁহাকে স্মরণ করি, সেই সময়ই জীবন; যে সময় তাঁহার আনন্দ উপভোগ করি, সেই সময়ই জীবন—যখন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হই, তখনি মৃত্যুর গ্রাস মধ্যে পতিত হই। তাঁহাকে যে সময় স্মরণ করি, সেই ব্রহ্ম-মুহূর্ত্ত—যে স্থানে স্মরণ করি, সেই ব্রহ্ম-লোক। আমরা যে সময়ে, যে দেশে, ঈশ্বরকে স্মরণ করি; সেই সময়, সেই দেশ, পবিত্র হয়। সেই পবিত্র-স্বরূপকে কে লাভ করিতে পারে? যে শ্রদ্ধাবান্ হয়, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলে সেই পবিত্র নিকেতনে কে যাইতে সমর্থ হইবে? শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং

তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। যাহার চিত্তের একাগ্রতা হয়—তাঁহাকে না পাইলেই নয়, তাঁহার প্রতি যাহার এই প্রকার চিত্তের তৎপরতা হয়; সেই শ্রদ্ধাবান্ তৎপরায়ণ পুরুষ তাঁহাকে লাভ করে। ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়-কামনায় ব্যাকুল না হয়, কিন্তু প্রভুকে দেখিয়া দাসদিগের ন্যায় তাহারা যখন সংযত থাকে; তখন চিত্ত সাম্যভাবে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। ব্রহ্ম-লাভের ফল আরাম, ব্রহ্ম-লাভের ফল শান্তি। যতক্ষণ মনের শান্তি হয় নাই, আরাম হয় নাই; যতক্ষণ অন্তরে ক্রোধ রহিয়াছে, দ্বেষ রহিয়াছে; ততক্ষণ ব্রহ্মকে কখনই লাভ হয় নাই। ব্রহ্মকে লাভ করিবার ফল আরাম ও শান্তি। " শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিং অচিরেণাধিগচ্ছতি।" প্রথমে শ্রদ্ধা চাই, তৎপরে জ্ঞানের অন্বেষণ হইবে, ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে নিশ্চয় শান্তি। ঈশ্বর সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ঈশ্বরের উপাসনার ফল শান্তি, ঈশ্বরের উপাসনার ফল মুক্তি। "যায় শোক যায় তাপ যায় হৃদয়-ভার। সর্ব্ব সম্পৎ তাহে মেলে যখন থাকি তাঁর সাথ।" হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের সকলের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ প্রেরণ কর এবং আমারদের নিকটে প্রকাশিত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

দশম উপদেশ।

ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছা।

" সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সত্য কাম ও সত্য সংকল্প; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়।"

যাঁহার অলৌকিক শক্তি দ্বারা চেতন অচেতন সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে ও বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। তাঁহার শক্তির সীমা নাই, তাঁহার শক্তির পরিমাণ হয় না, তাঁহার শক্তির গুরুভার বুদ্ধিতে ধারণ করা কাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। যে পদার্থে যত শক্তি বিদ্যমান আছে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অদ্ভুত শক্তিই তৎসমুদায়ের মূল। আমরা ক্ষুদ্রতম প্রদেশের অধিবাসী হইয়াও যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই সেই দিব্য শক্তির দীপ্যমান নিদর্শন-সকল দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য-ভাবে অভিভূত হইতে থাকি। আমাদের এই দেহ-রূপ ক্ষুদ্রতর গেহে যে সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য বিদ্যমান আছে, তাহাই সম্যক্ রূপে দর্শন করিয়া শেষ করা যায় না; তবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বাহিরে সেই বিশ্বকর্ম্মার কার্য্য কলাপ কে গণনা করিয়া উঠিবে? সূক্ষ্মতম কীটাণু অবধি স্থূলাঙ্গ মাতঙ্গ পর্য্যন্ত—বিন্দুমিত সর্ষপ অবধি গগনভেদী পর্ব্বত পর্য্যন্ত—ক্ষুদ্রতর শৈবাল অবধি অত্যুন্নত বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত—সংকীর্ণ পল্বল অবধি অতি বিস্তীর্ণ মহাসাগর পর্য্যন্ত, এই পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পৃথিবী যেমন অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ পুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়া সেই পূর্ণ-স্বরূপের কর-চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে; সেই রূপ এক একটি সৌর জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহার তুলনায় এমন পৃথিবীই অতি সামান্য বোধ হইবে। কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, কত ধূমকেতু, কত উল্কাপিণ্ড এই বৃহৎকায় দিবাকরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের প্রকাণ্ড আকৃতি, প্রচণ্ড বেগ, চিন্তা করিলে স্তব্ধ হইতে হয়। এই রূপ অগণ্য সৌর জগৎ-সকল ঈশ্বরের অসীম গগন-প্রাঙ্গনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এমন কি, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আকাশের যে কত দূর স্থান

অধিকার করিয়া আছে, তাহার আদি অন্ত অবধারণ করা যায় না। ভূতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, রসায়ণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যা তাঁহার অলৌকিক শক্তির যাহা কিছু পরিচয় করিতে পারিয়াছে, মনুষ্য যাবজ্জীবন শ্রবণ করিয়াও তাহারই শেষ করিতে পারে না। দিন দিন ঐ সমস্ত বিদ্যার যতই উন্নতি হইতেছে, ততই ঐশীশক্তির নব নব তত্ত্ব সকল অভিব্যক্ত হইয়া অনুসন্ধায়ীদিগের পরিশ্রমকে অতিক্রম করিতেছে।

আবার অধ্যাত্ম জগতের অদ্ভুত কাণ্ড-সকল ইহা অপেক্ষাও সহস্র-গুণ বিস্ময় উৎপন্ন করে। জড় শরীরে আত্মার জন্ম-গ্রহণ, তমঃ-প্রকাশবৎ পরস্পর-বিরুদ্ধ-স্বভাব শরীর ও শরীরীর একত্র মেলন, জড় জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বন্ধন; জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছার আশ্চর্য্য পরিবেশন, পরতন্ত্র আত্মাতে স্বাধীনতার সমাবেশ; ইত্যাদি এক একটি বিষয়ে ঈশ্বর যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; কোন্ মন তাহা অনুধ্যান করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে? একবিধ উপাদানে বিনির্ম্মিত আত্মা-সকল ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থান করিয়া কি বিস্ময়কর বিচিত্রতা প্রদর্শন করিতেছে! তাহারা অন্তরে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি বহিস্থিত বিষয় সকলের সহিত কি আশ্চর্য্য-রূপে ক্রীড়া করিতেছে। কি অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে কেবল ইচ্ছা দ্বারা কর চরণ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বিজাতীয় পদার্থ-সকলকে আপনার অভিপ্রেত কার্য্যে বিনিযোজিত করিতেছে। স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র শরীর মাত্র সহায় পাইয়া কি মহৎ মহৎ কর্ম্ম-সকল সম্পন্ন করিতেছে। ভূলোকে থাকিয়াও দ্যুলোকের সংবাদ অবগত হইতেছে, মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অমৃত-ভাবে স্ফীত হইতেছে, ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এবং সংসারে থাকিয়া সংসারের অতীত পদার্থে সমাগত হইতেছে! এই সকল যে আশ্চর্য্য শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে, কে তাহার পরিমাণ করিতে পারে? কিন্তু ইহাও সৃষ্টির সমুদায় অংশ নহে। কি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অধিভূত জগৎ, কি অন্তরে অনুভূয়মান অধ্যাত্ম রাজ্য; উভয়ত্রই তাঁহার যে সকল কার্য্য প্রকটিত হইয়া আছে; আমরা তাহার অত্যল্প ভাগ মাত্র অবগত হইতে পারিতেছি। তাঁহার সৃষ্টি আমাদের নিকট অপরিমেয় বোধ হইতেছে, কিন্তু তিনি এক কটাক্ষে সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অবলীলা ক্রমে ইহাকে ধারণ করিয়া আছেন। তথাপি কেবল তাঁহাকে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা বলিলে তাঁহার শক্তির সকল ভাব প্রকাশ পায় না; তিনি এমন কোটি কোটি জগৎ নিমেষের মধ্যে সৃষ্টি ও সংহার করিতে পারেন, তথাপি তাঁহার শক্তি পরিক্লান্ত হয় না।—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর।

শক্তি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয় না; কিন্তু পরিবর্ত্তন মাত্রই নিয়ত শক্তি-সাপেক্ষ—এই স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কোন পরিবর্ত্তন দর্শন করিলেই কোন প্রকার শক্তিকে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিয়া থাকি। তৃণ-সকল দগ্ধ হইতেছে ও নদী-কূল ভগ্ন হইতেছে দর্শন করিয়া আমরা অগ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের দ্রবকরী শক্তি অবধারণ করি; সেই রূপ যখন জানিতে পারি যে এই জগৎ এক সময়ে ছিল না, অসৎ অবস্থা হইতে সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন এই মহা পরিবর্ত্তের পূর্ব্বে একটি মহা শক্তির অস্তিত্ব আপনা হইতেই মনে হইয়া থাকে। আবার যখন

দেখিতে পাই, অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতির শক্তি দ্বারা যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে সৃষ্টির ভাব কিছুই নাই—তদ্দ্বারা হয় বিশ্লিষ্ট পদার্থ জাত একত্র সংহত হওয়াতে এক নূতন আকার নির্ম্মিত হইতেছে, নয় সংহত পদার্থ সমুদায় বিশ্লিষ্ট হওয়াতে পূর্ব্ব আকার ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। আকারের পরিবর্ত্তন ব্যতীত কোন নূতন বস্তু উৎপন্ন বা কোন পুরাতন বস্তু উৎসন্ন হইতেছে না, নির্ম্মাণ বা ভঙ্গ করিবার শক্তি ব্যতীত সৃষ্ট পদার্থে অন্যবিধ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন যে শক্তি দ্বারা জগৎ অসৎ অবস্থা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আর এক প্রকার পরতন্ত্র শক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। তাহা প্রাকৃতিক শক্তি নহে এবং প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় উপকরণ সাপেক্ষও নহে; তাহা অদ্ভুত শক্তি—তাহা অলৌকিক শক্তি; সমুদায় সৃষ্টিই সেই শক্তির কার্য্য, কিন্তু কোন সৃষ্টিই সে শক্তির অধিকারী নহে। তাহা অসাধারণ শক্তি; তাহা কেবল সেই একেই বিদ্যমান আছে, আর কাহাকেও তাহা প্রদত্ত হয় নাই।

যেমন পরিবর্ত্তন দর্শন করিলেই তাহার কারণ-স্বরূপ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস হয়; সেই রূপ কার্য্য-গত বৈলক্ষণ্য দ্বারা, শক্তি-গত বৈলক্ষণ্য অনুভূত হইয়া থাকে। অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থে বিভিন্ন প্রকার শক্তি-সকল বিদ্যমান আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যাবতীয় ভৌতিক শক্তির এই একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎসমুদায় চির কালই অন্ধের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। সহস্র-রশ্মি দিবাকর প্রখর করজাল বিস্তার করিয়া সমুদায় পৃথিবীকে সন্তপ্ত করিতেছে, ঘোরতর ঘনঘটা গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গম্ভীর গর্জ্জন সহকারে মুষল-ধারে বারি বর্ষণ করিতেছে, জলদ-জাল-বিলাসিনী বিদ্যুল্লতা মুহুর্ম্মুহু স্ফুরিত হইয়া জীব-জন্তুগণকে চমকিত ও চকিত করিয়া তুলিতেছে, প্রচণ্ড সমীরণ সমুত্থিত হইয়া গ্রাম নগর অরণ্য সমস্ত ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে, প্রবল মারুত-ক্ষোভিত মহা সাগর উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গী বিস্তার করিয়া দ্বীপোপদ্বীপ সকল গ্রাস করিতেছে; এই সমস্ত ভৌতিক ব্যাপারে একটি ক্রিয়াও জ্ঞান-কৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না;—কেবল এক অনিবার্য্য অন্ধ শক্তিরই নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহা দ্বারা সেই সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞান ব্যতীত আর কোন জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন জনসমাজে নেত্রপাত করি, তখন সেই প্রকার সৃষ্ট শক্তিরই আর এক মূর্ত্তি নিরীক্ষিত হইতে থাকে। সাগর-গর্ভ-সমুত্থিত অপূর্ব্ব দ্বীপ-শ্রেণী ও প্রান্তর-পরিশোভিত মনোজ্ঞ অট্টালিকা, সায়ন্তন মেঘমালার নানা বিধ আকৃতি ও সুচিক্কণ চিত্র-পটে সুচিত্রিত পশু পক্ষী, তরু-নিকর-সমাকীর্ণ দুর্গম মহারণ্য ও ফল-পুষ্প-সুশোভিত সুখ-সেব্য উপবন; এই সমস্ত পদার্থে আমরা স্পষ্ট-রূপেই বিভিন্ন প্রকার শক্তি অনুভব করিয়া থাকি। দ্বীপ শ্রেণী, মেঘমালা ও মহারণ্যে আমরা কেবল ঈশ্বরেরই জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই; যে সকল ভৌতিক পদার্থ স্ব স্ব শক্তি সহকারে ঐ সমস্ত বস্তুকে সংগঠিত করিয়াছে, তাহাদের জ্ঞানচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অট্টালিকা, চিত্রপট ও উপবন-সকল কেবল স্রষ্টার নয়, নির্ম্মাতারও জ্ঞানবত্তা স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিতেছে। অতএব ভৌতিক পদার্থের

জ্ঞান-বিরহিত অন্ধ শক্তি হইতে মনুষ্যের জ্ঞান-সহকৃত শক্তি যে বিভিন্ন; ইহা বলা বাহুল্য। এই জ্ঞান-সহকৃত শক্তির নাম ইচ্ছা।

অতএব যে শক্তির দ্বারা এই জ্ঞান-প্রাণ-সমন্বিত কৌশল-কলাপ-পরিপূর্ণ আশ্চর্য্য জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে; কি অন্ধীভূত ভৌতিক শক্তি, কি জ্ঞান-সহকৃত মানবীয় শক্তি, উভয়ই যে অদ্ভুত শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; যে শক্তি নভো-মণ্ডলস্থ দিবাকরের সহিত পৃথিবীস্থ মনুষ্যের সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছে; যে শক্তি ভাবী সন্তানের পোষণার্থ জননীর স্তনে দুগ্ধ দান করিয়াছে; যে শক্তি পৃথিবীকে মনুষ্যের যোগ্য ও মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে; যে শক্তি পাপ পুণ্যের সহিত দণ্ড-পুরস্কারের সংযোগ করিয়া মনুষ্যগণকে শাসন করিতেছে; কোন্ বুদ্ধি তাহা এক বারও অন্ধ শক্তি বলিয়া মনে করিতে পারে! তাহা জ্ঞান-সহকৃত শক্তি—তাহা দীপ্যমান ইচ্ছা। সেই সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ইচ্ছাই তাঁহার শক্তি এবং সেই শক্তিই তাঁহার ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছার বল অবগত হইবার নিমিত্ত একবার মানবীয় ইচ্ছার পরাক্রম আলোচনা কর। আপনাকে ও অন্যকে জ্ঞান পূর্ব্বক নিয়োগ করা ইচ্ছার কার্য্য। মানুষ যে কার্য্য করুক, ইচ্ছা তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিনী থাকে। ভৌতিক শক্তি অপেক্ষা ইহার পরাক্রম অনেক অধিক। আত্মা ইহারই প্রভাবে জড় প্রকৃতি শরীরকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, সময়ে সময়ে ভৌতিক শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে পরাজয় করিতেছে। ইহাই যন্ত্রী হইয়া মস্তিষ্ক রূপ যন্ত্রকে পরিচালিত করিতেছে; ইহারই আদেশে ইন্দ্রিয়গণ বহির্জ্জগতের সংবাদ-সকল আত্মার নিকট বহন করিতেছে; ইহারই নিয়োগে কর চরণ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহারই পরাক্রমে আত্মা দুর্নিবার প্রবৃত্তি-স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া পুরুষত্ব প্রদর্শন করিতেছে; এবং ইহারই সহায়তায় ধর্ম্ম-রূপ সরোবরে অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। অধিক কি, এই মানবীয় ইচ্ছা তরুলতা কানন গিরি নদী সাগর প্রভৃতি ঈশ্বর সৃষ্ট প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় ভূরি ভূরি গ্রাম নগর, উদ্যান আপণ সরোবর শস্য-ক্ষেত্র প্রভৃতি আশ্চর্য্য পদার্থ-পুঞ্জে পরিপূর্ণ এক মনোহর কৃত্রিম জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে এবং দিন দিন উহার বিস্তার ও শোভা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। এখানে মানবীয় ইচ্ছা নানাবিধ বন্ধনে বদ্ধ ও বিবিধ প্রতিবন্ধকে পরিবৃত হইয়াও যখন এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে, তখন ভবিষ্যতে—যখন বিমুক্ত হইয়া সম্যক স্ফুর্ত্তি লাভ করিবে—তখন ইহার পরাক্রম যে কি প্রকার হইবে, এখন তাহার পরিমাণ অবধারণ করা যায় না। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র জীব; প্রায় ইহাকে বহির্ব্বিষয় ও পশু-প্রকৃতির অধীন হইয়া থাকিতে হয়, এ শরীরের ভারে নিয়তই আক্রান্ত হইয়া আছে, ইহার জ্ঞান উপার্জ্জনের পাঁচটিমাত্র পথ, কর্ম্মের সময় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তা আবশ্যক; শরীরের সহিত ইহার এমন বন্ধন যে, শরীর ক্লান্ত হইলেই আপনিও কাতর হইয়া পড়ে; এমন দারিদ্র্য অবস্থায় থাকিয়াও আত্মার ইচ্ছার বল কেমন প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করিতেছে। অতএব যিনি নিরতিশয় মহান্, যাঁহার উপরে কোন শক্তি

কার্য্য করিতে পারে না, যিনি স্বভাবত মুক্ত, জ্ঞানে পূর্ণ, যিনি অসদবস্থা হইতে কেবল ইচ্ছা দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাঁহার ইচ্ছার বল কি আমরা কল্পনাতেও ধারণ করিতে পারি ! তিনি সত্য-কাম ও সত্য-সংকল্প—তাঁহার কল্পনা ও কামনা ব্যর্থ হইবার নহে—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়—তাঁহার ইচ্ছাকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাঁহার যে ইচ্ছা, সেই কাজ।

তত্ত্ববিদ্যা।

চতুর্থ প্রস্তাব। পূর্ব্বে কেবল এই পর্য্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছে যে বিষয়ী স্বাধীন ও বিষয় পরাধীন ; কিন্তু কার্য্য-কারণ-বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। পরন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে শেষোক্ত বিষয় লইয়া এখনও যে রূপ তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা কোন মতেই বিধেয় নহে ; অতএব কার্য্য-কারণের ভাব কি রূপ, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এটি জ্ঞান-কাণ্ড,এই হেতু তৃতীয় অধ্যায়ে কেবল জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিষয়ী স্বাধীন ও বিষয় পরাধীন ; কিন্তু আনুষঙ্গিক-রূপে ইহাও দর্শাইতে ত্রুটি করা হয় নাই যে শক্তির সহিত ইচ্ছারই বিশিষ্ট-রূপ সম্বন্ধ; অতএব এই ইচ্ছা সম্বন্ধে যে রূপ বিষয়ীর স্বাধীনতা ও বিষয়ের পরাধীনতা, তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বর্ত্তমান প্রস্তাবের যথেষ্ট মীমাংসা হইতে পারিবে। ইহা যেমন স্বতঃ-সিদ্ধ যে জ্ঞান দ্বারা অন্যকে জানিতে হইলে আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে জানিতে হয়,ইহাও সেই রূপ যে, ইচ্ছা দ্বারা অন্যকে নিয়মিত করিতে হইলে আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত করিতে হয়; উদাহরণ,যথা—পদ-দ্বয়কে পরিব্রজন কার্য্যে নিয়মিত করিতে হইলে আপনাকে পরিব্রাজক রূপে নিয়মিত করা কাযে কাযেই আবশ্যক হয়। এই রূপ আমরা মস্তিষ্ক চালনা করি, বা জ্ঞানেন্দ্রিয় চালনা করি, অথবা কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনা করি ; যে কোন কার্য্য করি, তাহার সঙ্গে আপনার দিগকে সেই সেই কার্য্যের কর্ত্তা রূপে নিয়মিত না করিয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকা যায় না। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে যে বিষয়ী আপনার উপরে এবং অন্যের উপরে উভয়ত্রই কার্য্য প্রকটন করিয়া থাকে। পরন্তু বিষয়-সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই রূপ দেখা যায় যে যদিও আকর্ষণাদি শক্তি দ্বারা এক বিষয় অন্য বিষয়কে নিয়মিত করে বটে; কিন্তু কোন বিষয়েরই এরূপ সামর্থ্য নাই যে উহা আপনি আপনাকে নিয়মিত করে। যথা—বিষয়-সকল আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আপনি আপনাকে আকর্ষণ করে না কিন্তু অন্য বিষয়-সকলকেই আকর্ষণ করে—বাধা-শক্তি দ্বারা আপনাকে বাধা প্রদান করে না, অন্যকেই বাধা প্রদান করে; প্রকাশ-শক্তির দ্বারা আপনার নিকটে প্রকাশিত হয় না, বিষয়ীর নিকটেই প্রকাশিত হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে বিষয়-সকল আপনারদের শক্তি দ্বারা আপনারদিগকে নিয়মিত করিতে কোন রূপেই সমর্থ নহে; সুতরাং উহারা যে অন্যের শক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। অতএব আমরা আপন আত্মাকেই দেখি,আর অন্য কোন বস্তুকেই দেখি,সর্ব্বত্রই কার্য্য-কারণের ভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; এবং এ ভাবটিকে ছাড়িয়া চলা জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অসাধ্য। আমরা যখন ইন্দ্রিয় দ্বারা একটা তরুকে প্রত্যক্ষ করি,

জ্ঞান-বিরহিত অন্ধ শক্তি হইতে মনুষ্যের জ্ঞান-সহকৃত শক্তি যে বিভিন্ন; ইহা বলা বাহুল্য। এই জ্ঞান-সহকৃত শক্তির নাম ইচ্ছা।

অতএব যে শক্তির দ্বারা এই জ্ঞান-প্রাণ-সমন্বিত কৌশল-কলাপ-পরিপূর্ণ আশ্চর্য্য জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে; কি অন্ধীভুত ভৌতিক শক্তি, কি জ্ঞান-সহকৃত মানবীয় শক্তি, উভয়ই যে অদ্ভুত শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; যে শক্তি নভো-মণ্ডলস্থ দিবাকরের সহিত পৃথিবীস্থ মনুষ্যের সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছে; যে শক্তি ভাবী সন্তানের পোষণার্থ জননীর স্তনে দুগ্ধ দান করিয়াছে; যে শক্তি পৃথিবীকে মনুষ্যের যোগ্য ও মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে; যে শক্তি পাপ পুণ্যের সহিত দণ্ড-পুরস্কারের সংযোগ করিয়া মনুষ্যগণকে শাসন করিতেছে; কোন্ বুদ্ধি তাহা এক বারও অন্ধ শক্তি বলিয়া মনে করিতে পারে! তাহা জ্ঞান-সহকৃত শক্তি—তাহা দীপ্যমান ইচ্ছা। সেই সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ইচ্ছাই তাঁহার শক্তি এবং সেই শক্তিই তাঁহার ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছার বল অবগত হইবার নিমিত্ত একবার মানবীয় ইচ্ছার পরাক্রম আলোচনা কর। আপনাকে ও অন্যকে জ্ঞান পূর্ব্বক নিয়োগ করা ইচ্ছার কার্য্য। মানুষ যে কার্য্য করুক, ইচ্ছা তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিনী থাকে। ভৌতিক শক্তি অপেক্ষা ইহার পরাক্রম অনেক অধিক। আত্মা ইহারই প্রভাবে জড় প্রকৃতি শরীরকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, সময়ে সময়ে ভৌতিক শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে পরাজয় করিতেছে। ইহাই যন্ত্রী হইয়া মস্তিষ্ক রূপ যন্ত্রকে পরিচালিত করিতেছে; ইহারই আদেশে ইন্দ্রিয়গণ, বহির্জ্জগতের সংবাদ-সকল আত্মার নিকট বহন করিতেছে; ইহারই নিয়োগে কর চরণ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহারই পরাক্রমে আত্মা দুর্নিবার প্রবৃত্তি-স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া পুরুষত্ব প্রদর্শন করিতেছে; এবং ইহারই সহায়তায় ধর্ম্ম-রূপ সরোবরে অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। অধিক কি, এই মানবীয় ইচ্ছা তরুলতা কানন গিরি নদী সাগর প্রভৃতি ঈশ্বর সৃষ্ট প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় ভূরি ভূরি গ্রাম নগর, উদ্যান আপণ সরোবর শস্য-ক্ষেত্র প্রভৃতি আশ্চর্য্য পদার্থ-পুঞ্জে পরিপূর্ণ এক মনোহর কৃত্রিম জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে এবং দিন দিন উহার বিস্তার ও শোভা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। এখানে মানবীয় ইচ্ছা নানাবিধ বন্ধনে বদ্ধ ও বিবিধ প্রতিবন্ধকে পরিবৃত হইয়াও যখন এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে, তখন ভবিষ্যতে—যখন বিমুক্ত হইয়া সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে—তখন ইহার পরাক্রম যে কি প্রকার হইবে, এখন তাহার পরিমাণ অবধারণ করা যায় না। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র জীব; প্রায় ইহাকে বহির্ব্বিষয় ও পশু-প্রকৃতির অধীন হইয়া থাকিতে হয়, এ শরীরের ভারে নিয়তই আক্রান্ত হইয়া আছে, ইহার জ্ঞান উপার্জ্জনের পাঁচটিমাত্র পথ, কর্ম্মের সময় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তা আবশ্যক; শরীরের সহিত ইহার এমন বন্ধন যে, শরীর ক্লান্ত হইলেই আপনিও কাতর হইয়া পড়ে; এমন দারিদ্র্য অবস্থায় থাকিয়াও আত্মার ইচ্ছার বল কেমন প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করিতেছে। অতএব যিনি নিরতিশয় মহান্, যাঁহার উপরে কোন শক্তি

কার্য্য করিতে পারে না, যিনি স্বভাবত মুক্ত, জ্ঞানে পূর্ণ, যিনি অসদবস্থা হইতে কেবল ইচ্ছা দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাঁহার ইচ্ছার বল কি আমরা কল্পনাতেও ধারণ করিতে পারি ! তিনি সত্য-কাম ও সত্য-সংকল্প—তাঁহার কল্পনা ও কামনা ব্যর্থ হইবার নহে—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়—তাঁহার ইচ্ছাকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাঁহার যে ইচ্ছা, সেই কাজ।

তত্ত্ববিদ্যা।

চতুর্থ প্রস্তাব। পূর্ব্বে কেবল এই পর্য্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছে যে বিষয়ী স্বাধীন ও বিষয় পরাধীন ; কিন্তু কার্য্য-কারণ-বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। পরন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে শেষোক্ত বিষয় লইয়া এখনও যে রূপ তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা কোন মতেই বিধেয় নহে; অতএব কার্য্য-কারণের ভাব কি রূপ, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এটি জ্ঞান-কাণ্ড,এই হেতু তৃতীয় অধ্যায়ে কেবল জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিষয়ী স্বাধীন ও বিষয় পরাধীন ; কিন্তু আনুষঙ্গিক-রূপে ইহাও দর্শাইতে ত্রুটি করা হয় নাই যে শক্তির সহিত ইচ্ছারই বিশিষ্ট-রূপ সম্বন্ধ; অতএব এই ইচ্ছা সম্বন্ধে যে রূপ বিষয়ীর স্বাধীনতা ও বিষয়ের পরাধীনতা, তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বর্ত্তমান প্রস্তাবের যথেষ্ট মীমাংসা হইতে পারিবে। ইহা যেমন স্বতঃ-সিদ্ধ যে জ্ঞান দ্বারা অন্যকে জানিতে হইলে আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে জানিতে হয়,ইহাও সেই রূপ যে, ইচ্ছা দ্বারা অন্যকে নিয়মিত করিতে হইলে আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত করিতে হয়; উদাহরণ,যথা—পদ-দ্বয়কে পরিব্রজন কার্য্যে নিয়মিত করিতে হইলে আপনাকে পরিব্রাজক রূপে নিয়মিত করা কাযে কাযেই আবশ্যক হয়। এই রূপ আমরা মস্তিষ্ক চালনা করি, বা জ্ঞানেন্দ্রিয় চালনা করি, অথবা কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনা করি ; যে কোন কার্য্য করি, তাহার সঙ্গে আপনার দিগকে সেই সেই কার্য্যের কর্ত্তা রূপে নিয়মিত না করিয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকা যায় না। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে যে বিষয়ী আপনার উপরে এবং অন্যের উপরে উভয়ত্রই কার্য্য প্রকটন করিয়া থাকে। পরন্তু বিষয়-সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই রূপ দেখা যায় যে যদিও আকর্ষণাদি শক্তি দ্বারা এক বিষয় অন্য বিষয়কে নিয়মিত করে বটে; কিন্তু কোন বিষয়েরই এরূপ সামর্থ্য নাই যে উহা আপনি আপনাকে নিয়মিত করে। যথা—বিষয়-সকল আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আপনি আপনাকে আকর্ষণ করে না কিন্তু অন্য বিষয়-সকলকেই আকর্ষণ করে—বাধা-শক্তি দ্বারা আপনাকে বাধা প্রদান করে না, অন্যকেই বাধা প্রদান করে; প্রকাশ-শক্তির দ্বারা আপনার নিকটে প্রকাশিত হয় না, বিষয়ীর নিকটেই প্রকাশিত হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে বিষয়-সকল আপনারদের শক্তি দ্বারা আপনারদিগকে নিয়মিত করিতে কোন রূপেই সমর্থ নহে; সুতরাং উহারা যে অন্যের শক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। অতএব আমরা আপন আত্মাকেই দেখি,আর অন্য কোন বস্তুকেই দেখি,সর্ব্বত্রই কার্য্য-কারণের ভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে; এবং এ ভাবটিকে ছাড়িয়া চলা জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অসাধ্য। আমরা যখন ইন্দ্রিয় দ্বারা একটা তরুকে প্রত্যক্ষ করি,

তখন আলস্য, জড়তা বা অজ্ঞান আসিয়া আমারদের কর্ণে এই রূপ কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে উহার আবার কারণ কোথায়, দেশ কালে যাহা প্রতিভাত হইতেছে তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু বুদ্ধি সেই আলস্যকে পরাজয় করিয়া উক্ত ইন্দ্রিয়-গোচর বৃক্ষের প্রতিমাকে মনো-রূপ দর্পণে আবির্ভাব মাত্র মনে করে এবং ভাব-রাজ্যে উহার কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়; বুদ্ধি উক্ত বৃক্ষের বাহ্য আবির্ভাব ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে একটি জীবনী শক্তিকে (ইন্দ্রিয়ে নহে) ভাবে উপলব্ধি করে। ইতিপূর্ব্বে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে যে বিষয়ী স্বাধীন; কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে বিষয়ী আপন ইচ্ছানুসারে স্বাধীন হয় নাই; ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই উহা স্বাধীন হইয়াছে এবং নিয়ত কাল স্বাধীন-রূপে বর্ত্তিতেছে; সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন। ঈশ্বর চাহেন যে আমরা স্বাধীন হই, এই জন্যই আমরা স্বাধীন হইয়াছি; আমরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষের অধীন বলিয়াই এমন যে অমূল্য রত্ন স্বাধীনতা, তাহা অবলীলা-ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন শরীরের অভ্যন্তরে একই আত্মা স্বাধীন-রূপে কার্য্য করিতেছে; সেই রূপ কি জড়, কি আত্মা, প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মা সম্যক্ স্বাধীনতা-সহকারে কার্য্য করিতেছেন। ঈশ্বর যিনি তিনি সকল কারণের কারণ, সকল অধিপতির অধিপতি। ইউরোপীয় কোন কোন পণ্ডিত-সম্প্রদায় এই রূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে "কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে"—ইহা একটি কথার কথা মাত্র। ইহাঁদের মতে, যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহা কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ-সত্তা আমাদের জ্ঞানে একবিন্দুও স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং কার্য্য-বিশেষের কারণ আছে, ইহা কেবল আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। ইহাঁদের প্রতি বক্তব্য এই যে আমরা যখন আপনারদিগকে কোন কার্য্যের কর্ত্তা-রূপে নিয়মিত করি, তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও মনকে এরূপ প্রবোধ দিতে পারিনা যে উক্ত কার্য্যের আমরা আপনারা কারণ নহি। অতএব স্বাধীন কারণ যে আছে—ইহা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে জাজ্বল্য-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। আত্মা অপনি আপনাকে নিয়মিত করে, এই হেতু আত্মাতে কার্য্য এবং কারণ উভয়ই একত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়-সকলেতে এই রূপ দেখা যায় যে বীজ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, বৃক্ষ তাহার উর্দ্ধে;—কারণ এক স্থানে কার্য্য অন্যত্র; বিষয়-সকলেতে কার্য্য এবং কারণ এই রূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে বলিয়া, কার্য্য যেখানে—কারণকে সেখানে পাওয়া যায় না, ইহাকে আর কোথাও অন্বেষণ করিতে হয়। এই জন্য বিষয়-ক্ষেত্রে কেহ কেহ যে আলস্য পরবশ হইয়া কেবল কার্য্য টুকু মাত্রেই স্থগিত থাকিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু যথার্থ সত্যের প্রতি একটুকু প্রণিধান করিলেই প্রকাশ পাইবে যে বিষয়েতেও কারণ-ভাব উপলব্ধি করিতে আমাদের স্বল্প মাত্রও বিলম্ব হয় না; কেন না রূপ রস প্রভৃতির কারণ-রূপেই আমরা বিষয়-সকলকে উপলব্ধি করিয়া থাকি। রূপ রস প্রভৃতির আবির্ভাব সকল আকস্মিক ব্যাপার নহে; প্রত্যুত বহির্ব্বিষয়ের শক্তি-যোগেই উহারা প্রকটিত হয়—ইহা অপেক্ষা সহজ সত্য আর কি হইতে পারে? তথাপি এবিষয়ে এই রূপ এক আপত্তি হইতে পারে যে স্বপ্ন-কালে আমরা রূপ রসাদি নানাবিধ আবির্ভাব

প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, অথচ তাহার মূলে বাস্তবিক পদার্থ একটিও নাই; যাহা কিছু সকলই কাল্পনিক। ইহার এ ক্ষণে মীমাংসা করা যাইতেছে। স্বপ্ন-কালে আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, তাহা আমারদের আপন ইচ্ছাধীন নহে; সুতরাং তাহাও যে বহির্ব্বস্তু-মূলক তাহাতে আর সংশয় নাই। রূপ রস প্রভৃতির বাহন-স্বরূপ আলোকাদি ভৌতিক বস্তু-সকল এত সূক্ষ্ম যে তাহা ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া আমারদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করত তথায় বিধৃত হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। এই সকল সূক্ষ্ম পদার্থ-নিচয়ের মধ্যে জাগ্রৎ-কালে আমরা কল্পনা-দ্বারা যে সকল যোগাযোগ সংস্থাপন করি, বুদ্ধি তখন অন্যান্য গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, তাহারা সে সময়ে স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পায় না; কিন্তু নিদ্রা-কালে যখন আমারদের বুদ্ধি-বৃত্তি শিথিল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা শ্রেণী-পরম্পরায় অল্পে অল্পে উদ্বোধিত হইয়া নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকে। পরন্তু স্বপ্ন-গত বিষয়-সমূহে দেশ-কাল-ঘটিত কৃত্রিমতার প্রাদুর্ভাব বলিয়া উহারদিগের বিষয়ত্ব অস্বীকার করা কোন রূপেই যুক্তি সিদ্ধ নহে; কেন না পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিষয় মাত্রেতেই ঐ রূপ কৃত্রিমতা অবস্থান করে—অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাতে মস্তিষ্ক-বিলীন বিষয়-সকলকে আমরা যে দূর দূর দেশে প্রত্যক্ষ করি, তাহা সেই রূপ কোন নিয়মানুসারে হইবে; যেমন দূরবর্ত্তিতা হেতু বৃহৎ সূর্য্যকে আমরা অল্পায়তন মনে করি ও দুঃখ-আগমন হেতু অল্প-পরিমাণ সময়কে সুদীর্ঘ মনে করি। অতএব ইহা সর্ব্ব-প্রকারেই স্থিরতর হইল যে ইন্দ্রিয়-বোধের কারণ-রূপেই আমরা বিষয়-সকলকে উপলব্ধি করি। ইহাও নিশ্চয় যে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়বোধের কারণ—বিশেষ বিশেষ বিষয়; যথা রূপ বোধের কারণ আলোক, গন্ধ বোধের কারণ অন্য কোন বিষয়; তরুর কারণ এক বিষয়, বিশেষ বিশেষ শাখার কারণ আর আর বিশেষ বিশেষ বিষয়, বিশেষ বিশেষ পল্লবের কারণ অপরাপর বিষয়, ইত্যাদি। অবশেষে বক্তব্য এই যে কার্য্য-কারণ-বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে এই মূল তত্ত্বটিকে মাত্র স্মরণ করা যে পরিবর্ত্তন মাত্রেরই উপযুক্ত কারণ আছে, তাহা হইলেই সকল সংশয় তিরোহিত হইবে।

পঞ্চম প্রস্তাব।—কেবল বুদ্ধির পরিচালনা করা তত্ত্ববিদ্যার উদ্দেশ্য নহে; মুক্তি সাধনই তত্ত্ববিদ্যার এক মাত্র লক্ষ্য। এই হেতু যে সকল জ্ঞান এই মুক্তি সাধনের সহায়তা করিতে পারে, বর্ত্তমান জ্ঞান-কাণ্ডে কেবল তাহারদিগকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। "কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই।" যাঁহারা বলেন যে তর্ক বিতর্ক অভ্যাস ও বাগ্বল উপার্জ্জন করাই তত্ত্ববিদ্যার এক মাত্র ফল, তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই ওরূপ কথা উচ্চারণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে। প্রথমে যখন গণিত-শাস্ত্রে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন তাহা কি পর্য্যন্ত না অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়? "সংকলন ব্যবকলন" "গুণন হরণ" এ সকল কার্য্যে কি পর্য্যন্ত না পণ্ড-শ্রম মনে হয়? কিন্তু সেই গণিত-বিদ্যা অবলম্বন করিয়া যখন গৃহ-নির্ম্মাণ, ভূমি-পরিমাপন প্রভৃতি নানাবিধ আবশ্যক কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করা যায়, এবং ভৌতিক বিদ্যা সম্বন্ধীয় নানাবিধ আশ্চর্য্য তথ্য-সকলকে পরীক্ষার অধীনে আনয়ন করা

যায়; তখন আর তাহার মহিমা কাহারো নিকটে গোপন থাকিতে পারে না। কিন্তু গণিত বিদ্যার এই যে মাহাত্ম্য, ইহা দুই বা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে লোক-সমাজে এতাধিক পরিমাণে কি বিদিত ছিল? না। কেন বিদিত ছিল না? যেহেতু তখন গণিত বিদ্যাকে কার্য্যে এত দূর প্রয়োগ করা হয় নাই। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গণিত বিদ্যার যে রূপ অবস্থা ছিল, তত্ত্ববিদ্যার এখনো সে অবস্থা যায় নাই। তত্ত্ববিদ্যা-ঘটিত অনেক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারদিগকে রীতি মত কার্য্যে প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি এখনো উত্তমরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। এতাবৎ কাল তত্ত্ব-গ্রন্থ-সকলের প্রায়ই এই রূপ পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে যে জ্ঞান-কাণ্ড কেবল অতিরিক্ত তর্ক বিতর্কেই ক্ষেপিত হয়; এবং কর্ম্ম-কাণ্ডকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আর এক স্বতন্ত্র পত্তন-ভূমিতে সংস্থাপিত করা হয়। আধুনিক জন-সমাজে তত্ত্ববিদ্যার নামে যে একটি অপবাদ আছে যে উহাতে তর্ক বিতর্ক অভ্যাস ব্যতিরেকে আর কোন ফলই দর্শে না—ইহার কারণ এ ক্ষণে স্পষ্ট-রূপে বুঝা যাইতেছে। সে কারণ এই;—এত দিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববিদ্যা কেবল এই রূপে আলোচিত হইয়া আসিতেছে যে কার্য্যের সহিত তাহার যে কোন সম্পর্ক আছে ইহা সুস্পষ্ট বোধ হয় না। উদাহরণ;—কুজান, হামিল্টন প্রভৃতি যে সকল তত্ত্ববিৎ ইউরোপ দেশে অধুনা সর্ব্বাগ্রগণ্য-রূপে বিখ্যাত, সকলেই জর্ম্মন্-দেশীয় মহাত্মা কাণ্টকে ভক্তি-ভাজন গুরু-রূপে মান্য করিয়াছেন। এই বিখ্যাত মহাত্মা তত্ত্ববিদ্যা-সম্বন্ধে যে এক প্রকৃষ্ট প্রণালী সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ও যে সকল নিগূঢ় সত্যের আভাস প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া তত্ত্ব-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে কেহই সমর্থ নহেন। তাঁহার সময়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া জড়নিষ্ঠতার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই রূপ আসুরিক ভাবের প্রতিবিধান-মানসে তিনি তাহার বিপরীত ভাবের এক খানি মূল গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি প্রথমে যে এক খানি অনুপম গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার তিনি নাম দিয়াছিলেন "বিশুদ্ধ জ্ঞানের দোষ-গুণ-বিচার।" ইহাতে তিনি এই সত্যটি বিশেষ-রূপে স্থাপন করেন যে বহির্ব্বস্তু হইতে আমরা জ্ঞানের উপকরণ বা সামগ্রী-সকল প্রাপ্ত হই; কিন্তু যে প্রণালী অনুসারে উক্ত উপকরণ-সকলকে জ্ঞান আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া গড়িয়া লয়, জ্ঞানের সেই যে গঠন-প্রণালী, তাহা অমরা বহির্ব্বস্তু হইতে পাই না। প্রত্যুত আপনারদের অন্তর হইতেই যোগাইয়া থাকি। যথা—রূপ রস প্রভৃতি উপকরণ-সকলকে আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই; কিন্তু দেশ, কাল, একত্ব, অনেকত্ব, বস্তু, গুণ, কার্য্য-কারণ, এই যে-সকল প্রণালী অনুসারে আমরা উহারদিগকে জ্ঞানে আয়ত্ত করি, এই প্রণালীগুলি আমরা আপন অন্তর হইতে প্রাপ্ত হইয়া রূপরসাদি উক্ত উপকরণ-সকলের উপর তাহারদিগকে আরোপিত করি। এই রূপ মহাত্মা কাণ্ট—একাকী ও অসহায়—কেবল আপনার মাত্র অনুসন্ধান দ্বারা ইহা যৎপরোনাস্তি অবিতথ-রূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে সকল সত্যই আমরা কেবল বাহির হইতে প্রাপ্ত হই না,—একপ্রকার সত্য আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই, আর একপ্রকার সত্য আমরা অন্তর হইতে প্রাপ্ত হই; এবং এই দুই প্রকার সত্যের মধ্যে তিনি যথো-

চিহ্ন প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানের প্রণালী-সকল যাহা আমরা অন্তর হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্ব-ভৌমিক; এবং জ্ঞানের উপকরণ-সকল যাহা আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা আনুসঙ্গিক ও বিশেষ বিশেষ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানের প্রণালী-সকল জ্ঞান হইতে তিলার্দ্ধও অন্তর থাকিতে পারে না; সুতরাং আমরা যে কোন বিষয়কে জানি, ঐ সকল প্রণালী অনুসারেই তাহাকে জানিতে হয়। এই প্রণালী-সকল জ্ঞানের সহিত অবশ্যই বিদ্যমান থাকে বলিয়া ইহারা অবশ্যম্ভাবী; এবং যাবতীয় জ্ঞানের সঙ্গে—জ্ঞান মাত্রেরই সঙ্গে—বিদ্যমান থাকে বলিয়া ইহারা সার্ব্ব-ভৌমিক-রূপে আখ্যাত হইয়াছে। অতঃপর কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানের উক্তরূপ প্রণালী-সকলের দোষ গুণ বিচার করিতে গিয়া অতল-স্পর্শ সংশয়-সাগরে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সংশয় এই,—আমারদের জ্ঞান-প্রণালী অনুসারেই যখন সত্য-বিশেষ প্রকাশ পায়, তখন সে সত্য যে উক্ত প্রণালী দ্বারা বিকৃত ও রূপান্তরিত না হইবে, তাহার প্রমাণ কি? অতএব আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমার জ্ঞানের প্রণালী অনুসারে এটি সত্য; কিন্তু তাহা যে বাস্তবিক সত্য কি না, এ বিষয়ে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। এই রূপ মহাত্মা কাণ্ট বাস্তবিক সত্যে সংশয়াপন্ন হইয়া আপন প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন, ও কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় তর্ক বিতর্কে জড়িত হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়া রহিলেন; এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা ঐ সকল বিষয়েরই বাহুল্য-রূপ আন্দোলনে তাঁহারদের বিদ্যা বুদ্ধি সমুদায় সমর্পণ করিলেন। এই রূপ করাতেই শাস্ত্রদিগের কর্ত্তৃক তত্ত্ববিদ্যার নামে যে এক মিথ্যা অপবাদ ইউরোপ প্রদেশে রটিত হইয়াছিল, তাহা হ্রাস না হইয়া ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু বাস্তবিক সত্য সম্বন্ধে কাণ্টের এতাধিক সংশয়-জনক তর্ক বিতর্ক কেন? যদি মূলে বাস্তবিক সত্য কিছুই না থাকে, তবে জ্ঞানের গঠন-প্রণালীই বা কি? জ্ঞানের উপকরণ সামগ্রীই বা কি? "বাস্তবিক সত্য অবশ্যই আছে" ইহা যদি তিনি প্রথমে স্বীকার না করেন, তবে তিনি জ্ঞানকেই বা কি রূপে সত্য বলিবেন? জ্ঞানের প্রণালী-সকলকেই বা কি রূপে সত্য বলিবেন? জ্ঞানের উপকরণ-সকলকেই বা কি রূপে সত্য বলিবেন? এবং এক মাত্র অগাধ সংশয়ের স্বপক্ষে এবং আর তাবতেরই বিপক্ষে তিনি স্বয়ং যে সকল সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহাই বা তিনি কি রূপে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন? এই রূপ দেখা যাইতেছে যে কোন প্রণালী ব্যতিরেকেও ইহা তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে বাস্তবিক সত্য অবশ্যই আছে। অতএব তিনি যে বলেন যে আমরা কেবল আমারদের নিজের জ্ঞান-প্রণালী অনুসারেই সত্য জানিয়া থাকি, একথা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। দেশ, কাল, একত্ব, অনেকত্ব, বস্তু, গুণ, কার্য্যকারণ—সত্য জানিবার এই যে সকল প্রণালী—ইহারা কি আমারদের নিজের মনঃ-কল্পিত প্রণালী? কখনই না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহা যথোচিত-রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে সকল হইতে বাস্তবিক সত্য যিনি পরমাত্মা—উক্ত প্রণালী-সকল তাঁহারি প্রতিষ্ঠিত। উহারা যদি আমারদের মনঃ-কল্পিত হইত, তাহা হইলে আমার জ্ঞান-প্রণালী এক রূপ হইত, অন্যের জ্ঞান-প্রণালী আর এক রূপ হইত; কিন্তু সকল আত্মা-সম্বন্ধে যখন উহারা অব-

শ্যই একই প্রকার হইতে চায় ; তখন উহারা যে আমারদের নিজের নিজের প্রণালী নহে, প্রত্যুত পরাৎপর সত্য-স্বরূপের প্রতিষ্ঠিত অনতিক্রমণীয় প্রণালী ; ইহা বলা বাহুল্য। অতএব "সত্যের সত্য পরমাত্মাই মূল-প্রণালী-সকলের প্রবর্ত্তক ও সমুদায় জগৎ তাঁহার নিয়মের অধীন" ইহাতে অগ্রে বিশ্বাস না করিলে জ্ঞানের উক্ত প্রণালী-সকলের বাস্তবিকতা ও বলবত্তা কোন মতেই আমারদের বিশ্বাস-গম্য হইতে পারে না। আমরা আপনারা নহি পরন্তু সেই পরমাত্মাই উক্ত বিশ্বাসের মূল ও সর্ব্বস্ব; এবং এই পরমাত্ম-জ্যোতির নিকটে কোন সংশয়ই স্থান পাইতে পারে না। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হইয়া দেখান যাইতেছে যে তত্ত্ববিদ্যা এ রূপ কোন অলীক সামগ্রী নহে যে তর্ক-বিতর্কেরই সময় তাহার রসনাতে স্ফূর্ত্তি হয়, পরন্তু কার্য্যের সময় উহা হইতে কোন উপকারই পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য মুক্তি-সাধন; অনর্থক তর্ক বিতর্কের আবর্ত্তে নিয়ত কাল পরিভ্রমণ করা উদ্দেশ্য নহে। এই জন্য দেশ-কাল, বিষয়-বিষয়ী, ঈশ্বর-জগৎ, এই সকল সত্য আমারদের সহজ জ্ঞানে যে রূপ উপলব্ধি হয় তাহা বিনা সংশয়ে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা হইয়াছে। গণিত-বিদ্যার গ্রন্থ-কর্ত্তারা গণিতের বীজ-সত্য-সকল লইয়া যে কারণে বৃথা তর্ক বিতর্ক উত্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ, সেই কারণেই আমরা তত্ত্ববিদ্যার বীজ-সত্য-সকল লইয়া বৃথা বাক্য ব্যয় করিতে সর্ব্বদাই সাবধান হইয়াছি। কাণ্ট কেবল জ্ঞানের স্বতঃ-সিদ্ধ প্রণালীগুলি আবিষ্কার করিতে সবিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক সত্তার সহিত যে তাহাদের পদে পদে যোগ আছে—তাহারা যে কেবল শূন্য প্রণালী মাত্র নহে—ইহার মীমাংসা-স্থলে তিনি বিষম সংশয়-চক্রে পড়িয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে ঐ অভাবটির পূরণ উদ্দেশে ইহা স্পষ্ট-রূপে দেখান হইয়াছে যে ইয়ত্তা লক্ষণ ও শক্তি-ঘটিত-প্রণালী-সকল পূর্ণ-রূপে পরমাত্মা ও জগতের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে ; সুতরাং বাস্তবিক সত্তাই উহারদের মূল। আমরা সাধ্য মতে ইহাই প্রদর্শন করিতে নিয়ত যত্ন পাইয়াছি যে প্রথমতঃ পরমাত্মা জীবাত্মা ও বহির্বিষয়, তিনেরই বাস্তবিক সত্তা আমারদের আত্ম-প্রত্যয়ে স্বতঃ-সিদ্ধ-রূপে প্রকাশিত আছে। দ্বিতীয়তঃ বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ কি রূপ ও পরমাত্মার সহিত জগতের সম্বন্ধ কি রূপ, ইহা তত্ত্ববিদ্যা আলোচনা দ্বারা যথোচিত-রূপে জানা যাইতে পারে। বাস্তবিক-সত্তা-বিষয়ক এই যে প্রত্যয় এবং উহারদের সম্বন্ধ-বিষয়ক এই যে জ্ঞান; ইহা যে মুক্তি-সাধনের পক্ষে কি রূপ উপযোগী, তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

লোকেরা যখন সুখাশ্বাসে আমোদ-কোলাহলের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহাতে তাহারদের মস্তক ভ্রাম্যমাণ হইলেও তাহারা মনে করে যে এ ক্ষণকার এই অবস্থাই স্থায়ী অবস্থা; কিন্তু তাহা হইতে দূরে থাকিয়া যাঁহারা দিব্য-ধামের শান্তি উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারাই দেখিতে পান যে সে অবস্থা বিভ্রান্তি ও কোলাহলের সমুদ্র-বিশেষ। কল্য এক রূপ, অদ্য এক রূপ, পর দিন আর এক রূপ সুখ দুঃখ, হর্ষ শোক, কতই পরিবর্ত্তন ; ইহার মধ্যে লোকেরা প্রাণ-পণে অর্থ সঞ্চয় করিতেছে, গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, খ্যাতি বিস্তার করিতেছে ; কেন ? না তাহাতে স্থায়ী সুখ

লাভ হইবে। বিষয়-সকল পরাধীন, আমরা স্বাধীন—বিষয় সকল যে আমারদের উপর প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমারদের কখনই সহ্য হইতে পারে না; প্রত্যুত বিষয়ের উপর আমরা প্রভুত্ব করিব, ইহাই আমারদের মনোগত অভিপ্রায়;—যাঁহারা স্থায়ী সুখ উপার্জ্জনে ব্রতী হইয়াছেন, এই অভিপ্রায়টি চরিতার্থ করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তথাপি আমরা পথি মধ্যে মোহাচ্ছন্ন হইয়া বিলাপ করি যে "আমি নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত, নানা বিষয়াভাবে পরিবৃত, নানা বিষয়ের অধীন; কাল-স্রোত চলিতেছে, আমিও তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতেছি, ইহা ব্যতীত আমা কর্ত্তৃক আর কি হইতে পারে?" এই সময়ে তত্ত্ববিদ্যা আসিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কহেন যে "বিষয়ের সম্বন্ধে তুমি এক, তোমার কোন অভাব নাই, তুমি স্বাধীন" যাঁহারা বলেন যে বাহিরে এই যে সকল পদার্থ আছে, ইহাই আমরা জানি, আত্মাকে আমরা জানিনা; পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাঁহারদের ভ্রম দূরীকরণ জন্য একটি অতি সুনিপুণ উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—"কোন স্থানে দশ জন পুরুষ একত্র হইয়া এক নদীর পর-পারে গমন পূর্ব্বক আপনারদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য যিনিই গণনা করেন, তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতর নয় জনকে দেখেন, এবং নয় জনকে দেখিলেও নয় সংখ্যাতে বিভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া স্বয়ং যে দশম, ইহা জানিতে পারেন না। তখন তাঁহারা ভ্রান্তি বশতঃ বলিলেন যে দশম পুরুষ দেখিতেছি না, অতএব তিনি নাই। পশ্চাৎ নদী-জলে দশম পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া শোক ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই কালে কোন অভ্রান্ত পুরুষ আসিয়া বলিলেন যে তোমারদিগের দশম পুরুষ মরে নাই—আছে। পরে গণনা করিয়া তুমিই দশম পুরুষ, এই রূপ উপদিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষরূপে দশম পুরুষকে দেখিয়া রোদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা হর্ষযুক্ত হইলেন।" এই রূপ, আমরা আপন আত্মাকে প্রতিক্ষণেই জানিতেছি, যে কোন বিষয় জানিতেছি, তাহারই সঙ্গে আত্মাকে সেই বিষয়ের জ্ঞাতা রূপে জানিতেছি; অথচ গণনা কালে শরীরাদি বিষয় পর্য্যন্ত গণনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকি, আত্মাকে আর গণনা করি না। পরে তত্ত্ববিদ্যা আসিয়া আমারদিগকে বলেন যে তুমি এ-বিষয় জানিতেছ ও-বিষয় জানিতেছ; কিন্তু তুমিই যে উক্ত বিষয় সকলের জ্ঞাতা—ইহা কি তুমি জানিতেছ না? তুমি কি কেবল পরকেই জানিতেছ; কিন্তু আপনাকে কি তুমি কিছু মাত্র জান না? তুমি যদি আপনাকেই না জান, তবে তুমি পরকে কি রূপে জানিবে? তত্ত্ববিদ্যার মুখে এই রূপ কথা-সকল শুনিয়া তবে যখন আমারদের চেতন হয়, পরে দেখি যে হারা-সামগ্রী আমারদের এই আত্মাকে পাইয়াও আমারদের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইতেছে না। পুনর্ব্বার আমরা মোহে মুগ্ধ হইয়া বিলাপ করি যে আমারদের আত্মা সে-দিনকার বই নয়—ইহা কত দিনই বা থাকিবে। কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় বা গমন করিবে! ইহার মধ্যে এমন কি আছে যে ইহা এত বহুমূল্য? এই পৃথিবীতে কিছু দিন যেন বিষয়ের উপর ইহার প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইল, কিন্তু পরে সে প্রভুত্ব কোথায় যাইবে? তত্ত্ববিদ্যা পুনর্ব্বার স্বর্গ হইতে আগমন করেন এবং এই রূপ উপদেশ দেন;—"তুমি এক্ষণে ভবনদীর মধ্য-স্থানে আসিয়া সংশয় তর-

ঙ্গের আন্দোলনে অতিশয় অধীর হইয়াছ; যদি তুমি ফিরিয়া যাও, তবে তোমার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে—ইহা তুমি জানিতেছ; তথাপি অগ্রসর হইতে তুমি ভীত হইতেছ; যে হেতু কোথায় যে কূল, তাহা তোমার নয়নগোচর হইতেছে না: এই ভয়ানক মধ্য গঙ্গাতে থাকিয়া তুমি কি বিনাশ পাইবে? অতএব প্রাণ-পণে অগ্রসর হও, শান্তির কূল অবশ্যই তোমার নয়নে দেখা দিবে। তুমি তোমার অপূর্ণ আত্মাকে জানিয়াছ, এক্ষণে পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মা যিনি তোমার সেই আত্মার পরা কাষ্ঠা—যিনি সংসার-সাগরের পর-পার—তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই পরম শান্তির অন্বেষণ পাইবে। তুমি কেবল আপনাকেই "আমি" বলিতেছ, কিন্তু ইহা দেখিতেছ না যে প্রত্যেক ব্যক্তিতেই ঐরূপ এক একটি "আমি" বিদ্যমান রহিয়াছে—এমন কি তোমার মত কোটি কোটি আত্মা হইবার কিছু মাত্র বাধা নাই। তোমার সম্বন্ধেই তুমি বলিতে পার যে "আমি এক" কিন্তু সত্যের সম্বন্ধে তোমার সদৃশ অনেক "আমি" সংসারে বিচরণ করিতেছে; পরন্তু সকল আত্মার যিনি অন্তরাত্মা, আত্মা হইতেও যিনি আত্মা, "আমি" হইতেও যিনি "আমি" যিনি ভাবতের অভ্যন্তর-স্থিত মূল সত্য; তিনিই কেবল সকলেরই সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে একমাত্র, তাঁহার সদৃশ একেবারেই অসম্ভব। তুমি এক, পরমাত্মা একমেবাদ্বিতীয়ং; তুমি ভাবাত্মক, পরমাত্মা পূর্ণ; তুমি স্বাধীন, পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন—কিনা মুক্ত; তোমাতে যে কোন সদাত্মক লক্ষণ পাওয়া যায়, পরমাত্মাকে তাহাই পরাকাষ্ঠা রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমার মনের সদ্ভাব তুমি যদি আর এক জনেতে দেখিতে পাও, তবে তুমি তাহার সহিত বন্ধুতা করিতে ব্যগ্র হও; কিন্তু পরমাত্মাতে তোমার মনের সকল সদ্ভাব পরাকাষ্ঠা-রূপে অবস্থিতি করিতেছে—কি জন্য তুমি তাঁহার বিরোধী হও? তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তবে পাপ-তাপ দুঃখ-শোক হইতে মুক্তি পাইয়া পরম আনন্দে অভিষিক্ত হইবে—ইহার আর অন্যথা নাই।" তত্ত্ববিদ্যার এই উপদেশানুসারে আমরা যখন অনাদি অনন্ত, সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, মঙ্গলময়, একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষের শরণাপন্ন হই; তখন আমরা নিশ্চয় জানিতে পাই যে, ঈশ্বর যিনি তিনি আমারদের অনন্ত কালের ঈশ্বর—যখন আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন তিনি আমাদিগকে কোন কালেই পরিত্যাগ করিবেন না। যদি এরূপ কুমন্ত্রণা বাক্য কখনো আমারদের কর্ণগোচর হয় যে, তোমার যিনি হৃদয়-বন্ধু, তিনি তোমাকে গোপনে বিনাশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন; তবে সেই প্রাণ-স্বরূপের অকৃত্রিম প্রেম-মুখের প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া আমরা হাস্য-মুখে ব্যক্ত করিতে পারি যে "ইঁহার হস্তে যদি আমারদের মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যুই আমারদের জীবন।

বর্ত্তমান খণ্ডের নানা অধ্যায়ে নানা প্রকার সত্য বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে সমুদায়ের সার মর্ম্ম এক্ষণে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হইতে পারে। সার মর্ম্ম এই—আমরা বিষয়ের সম্বন্ধে এক ভাবাত্মক ও স্বাধীন এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে দ্বৈত-সাপেক্ষ অপূর্ণ ও পরাধীন। পুনশ্চ "আমরা বিষয়ের অধীন" এই মিথ্যা-জ্ঞান হইতে আমরা যে পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করি, সেই পরিমাণে আমরা এই অবিতথ সত্য-জ্ঞানটি উপার্জ্জন করি যে, আমরা ঈশ্বরেরই স-

স্পূর্ণ অধীন ;—বিষয়-শৃঙ্খল হইতে যত আমরা মুক্ত হই, ঈশ্বরের সহিত তত আমরা যুক্ত হই। পুনশ্চ জ্ঞানময় প্রেমময় ঈশ্বরের অধীন-রূপে যত আমরা আপনারদিগকে উপলব্ধি করি, ততই আমরা অচেতন অসাড় বিষয়-সকলের সম্বন্ধে আপনারদিগের স্বাধীনতা হৃদয়ঙ্গম করি;—আমরা যত ঈশ্বরের অধীন হই, বিষয়-সকল ততই আমারদের অধীন হয়।

বিষয় হইতে আত্মার পৃথক্ সত্তা সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, শরীর মন যাহা কতক অংশে আমারদের আপনার-কর্তৃক নিয়মিত, তাহারদিগকে ঈশ্বরের নিয়মিত প্রাকৃতিক কার্য্য-কারণে সমর্পণ করা হয়; এবং অল্প পরিমাণে নিয়ন্তা যে আমারদের আত্মা, তাহাকে সর্ব্ব-নিয়ন্তা ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা হয়—তাহা হইলেই নিয়মিত-স্বভাব বিষয়-সকল হইতে নিয়ন্তৃ-স্বভাব আত্মার পৃথক্ত্ব স্পষ্ট-রূপে অনুভূত হইতে পারিবে। এখানে বিশেষ-রূপে জানা আবশ্যক যে দেশ-কাল-ঘটিত আবির্ভাব-সকলকে আমরা যে রূপ মনেতে কল্পনা করিতে পারি, আপন আত্মাকে আমরা কখনই সে রূপ কল্পনা করিতে পারি না। আত্মাকে আমরা জ্যোতি-ই বলি, মস্তিষ্ক-ই বলি, এবং শূন্য-ই বলি;—আত্মা তাহার কিছুই নহে। আত্মাকে ঘন-পিণ্ড-রূপে দেশেতে কল্পনা করা যায় না, অবস্থা-বিশেষ রূপে কালেতেও কল্পনা করা যায় না,—আত্মা কদাপি কাল্পনিক সামগ্রী নহে; প্রত্যুত আত্মা এ রূপ বাস্তবিক পদার্থ যে কল্পনার অগম্য হইলেও এক ভাবাত্মক ও স্বাধীন রূপে উহা আমারদের জ্ঞানে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে। কাহার বলে আমারদের আত্মা ও-রূপ সদ্গুণ-ত্রয়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে? যাঁহার বলে সমুদায় জগৎ স্ব স্ব স্বভাব পরিগ্রহ করিয়াছে—তাঁহারি বলে। আমরা অনেকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া এক-নিষ্ঠ হই, অভাবে ক্লিষ্ট না হইয়া স্পৃহা-শূন্য হই, পরাধীনতায় ম্রিয়মান না হইয়া স্বাধীন হই—ঈশ্বরের এই পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল ইচ্ছা সকল মনুষ্যেরই আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। "এক-নিষ্ঠ হইয়া, স্পৃহা-শূন্য হইয়া,স্বাধীন হইয়া, ঈশ্বরের রাজ্যে বিচরণ কর ; যথেচ্ছা-মঙ্গল-কার্য্য অনুষ্ঠান কর, এবং ঈশ্বরকে মনের সহিত ধন্যবাদ কর—এ কথাতে যেমন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সায় দিতে পারি, এত আর কিছুতেই নহে। এই রূপ আমার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে আমরা মুক্তির জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, তাহাই এই জ্ঞান-কাণ্ডের উদ্দেশ্য;—যে যে পথের মধ্য দিয়া মুক্তি-ধামে যাত্রা করিতে হইবে, তাহা দ্বিতীয় খণ্ড-নিহিত কর্ম্ম-কাণ্ডে সাবধানে অন্বেষণ করা যাইবে।

ইতি জ্ঞান-কাণ্ড সমাপ্ত।

সাধারণ আদর্শ।

ইতিহাস পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাজা ও রাজ-পুরুষেরা যে প্রকার আচার ব্যবহার ও যে প্রকার ধর্ম্মের অনুগত হন, তাঁহাদের আয়ত্তীকৃত প্রজামণ্ডলীতেও সেই প্রকার আচার ব্যবহার ও সেই প্রকার ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়া থাকে। তৎ সমুদায় কত দূর উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে তাদৃশ বিবেচনা উপস্থিত হয় না; কিন্তু রাজ-শক্তির এমনি একটি প্রভাব যে, সেই শক্তি যখন যে জাতির হস্তগত হয়, তখন তাহারদিগের

অবলম্বিত অতি কুৎসিত বিষয়গুলিও সাধারণ লোকের নয়ন ও মনকে অল্পে অল্পে বশীভূত করিয়া লয়। ইহার উদাহরণ-সংগ্রহের নিমিত্ত অধিক দূরে গমন করিবার আবশ্যকতা নাই, এক ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কৃতার্থ হওয়া যাইবে। যখন এ দেশের শাসন-ভার বৌদ্ধদিগের হস্তে বিন্যস্ত হয়, সেই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মের সমধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যত দিন উজ্জয়িনী প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আর একটি রাজ-বংশের অভ্যুদয় না হইয়াছিল, তত দিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এ দেশে অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করে; তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজাদিগের বল-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। কাল-ক্রমে যখন মুসলমানদিগের শাসন-শৃঙ্খলে ভারত বর্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল দৃঢ়বদ্ধ হইল, তখন মুসলমান রীতি নীতি, মুসলমান আচার ব্যবহার ও মুসলমান ধর্ম্মপদ্ধতি অল্পে অল্পে হিন্দু-সমাজে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অদ্যাপি হিন্দুদিগের মধ্যেও তাহার নিদর্শন-স্বরূপ সত্য পীর, পীর মামুদ, ও গাজী সাহেব প্রভৃতি মুসলমান গুরুদিগের আদর-পূর্ব্বক অর্চ্চনা দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। এ ক্ষণে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরা ভারত বর্ষের রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন; ইহাঁরদিগের প্রচুর ক্ষমতা, উন্নত বিদ্যা ও উৎকৃষ্ট রাজনীতি বহুল পরিমাণে হিন্দুদিগের মনোহর হইয়াছে। অতএব ঈদৃশ জাতির অবলম্বিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অসার হইয়াও অনেকের যে প্রীতিকর হইবে এবং ইহাঁরদিগের পূজনীয় যীসু খৃষ্ট মহান্ পুরুষ বলিয়া অনেকের যে আদরণীয় হইবে, ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু-সমাজের পৌত্তলিকতা-রূপ বিষম দোষের সংশোধনে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ইহাও অসম্ভব নয় যে, মুসলমান পীরদিগের ন্যায় যীসুখৃষ্টও কালক্রমে ভারত বর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবতার দল-ভুক্ত হইয়া যাইবেন। এ ক্ষণে এত দূর পর্য্যন্ত কথা উত্থিত হইয়াছে যে, বাইবলের যীসু খৃষ্ট সাধারণ আদর্শ। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছি যে খৃষ্টের চরিত্র কোন রূপেই সাধারণের অনুকরণীয় নহে। যাহারা খৃষ্টকে পৃথিবীর পাপ-মোচনার্থে অবতীর্ণ ঈশ্বর বলিয়া মনের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাদের অন্ধ ভক্তি দ্বারা খৃষ্টের চরিত্র যে রূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহাই যখন উন্নত-চেতা পণ্ডিতগণের নিকটে জঘন্য ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অনাদৃত হইতেছে; তখন, যাঁহারা খৃষ্টকে মনুষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা তাঁহাকে কত দূর উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবেন? যাঁহারা তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াও তাঁহাতে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির অতিরিক্ত গুণ আরোপিত করেন; তাঁহারদের বাক্যের কোন অর্থই নাই; তথাপি বাইবল খৃষ্টের যত দূর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছে, বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অধিক বলিতে কেহই সাহসী হইবেন না। কিন্তু বাইবলে লিখিত খৃষ্ট-চরিত লক্ষ্য করিয়াই আমরা বারংবার বলিতেছি যে, খৃষ্ট জন-সমাজের সমগ্র আদর্শ কখনই হইতে পারেন না। যদিও বাইবলের খৃষ্ট-চরিত পুরাণের প্রহ্লাদ-চরিত ও ধ্রুব-রচিত অপেক্ষা বড় অধিক বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না, তথাচ বাইবল অনুসারেও খৃষ্টকে সাধারণ সমগ্র আদর্শ কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না। সমগ্র আদর্শ কি রূপ হওয়া উচিত, তাহা গত বারের পত্রিকাতে প্রদ-

র্পিত হইয়াছে। তদনুসারে "পূর্ণ আদর্শ" এই উন্নত সংজ্ঞা পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও প্রদান করা যায় না। এক জন মনুষ্যকে—খ্রীষ্ট খৃষ্টকে সেই ঈশ্বরোচিত উন্নত সংজ্ঞা প্রদান করা আর মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বর বোধ করা, এই উভয়ে কি প্রভেদ থাকে? ট্রিনেটেরিয়ান খৃষ্টানেরা বাইবলের যে প্রকার অর্থ করে, যদি তাহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায়; তাহা হইলে এই বোধ হয় যে পুরাতন বাইবলে যে 'মেসায়া' অবতারের কথা উল্লিখিত আছে, খ্রীষ্ট খৃষ্ট আপনাকে সেই মেসায়া বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে খৃষ্টকে আদর্শ বলিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করা দূরে থাকুক; ঈশ্বরাভিমানী ঈশ্বরের সিংহাসন-লোলুপ দুরাচার বলিয়া তাঁহার প্রতি ঘৃণারই উদয় হইতে পারে। আর যদি ট্রিনেটেরিয়ান্‌দিগকে বাইবলের অর্থ গ্রহণে ভ্রান্ত অথবা বাইবলের ঐ সকল অংশ বাইবল-লেখকদিগের কপোল-কল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়; তাহা হইলে এই বোধ হয় যে, খ্রীষ্ট খৃষ্ট এক জন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন—তিনি আপনার বিশ্বাসানুযায়ী কতকগুলি মত লোকের নিকট প্রচার করিতেন, তদনুরোধে আর আর সমুদায় কর্ত্তব্য তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল। খৃষ্টের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধার জন্য অথবা কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে যদি তাঁহাকে এই উন্নত সময়ের উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত করিয়া প্রচারকরূপেই লোকের নিকট বাহির করা হয়; তাহা হইলেও প্রচারক ব্যতীত সংসারের আর কোন সম্প্রদায়ই খৃষ্টের অনুকরণ করিতে পারে না। অতএব খৃষ্টকে সাধারণ আদর্শ করিবার আশা কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না।

যে আদর্শের অনুকরণ করিতে হইবে, তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না হইলে সে অনুকরণ-জনিত ফল কখনই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। কিন্তু মনুষ্যের চরিত্র কখনই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইতে পারে না। বিশেষতঃ ত্যাগ স্বীকার, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি যে সকল গুণ ধর্ম্মের জন্য নিতান্ত আবশ্যক, খৃষ্টের চরিত্রে তাহা অল্পই লক্ষিত হইয়া থাকে—খৃষ্টের এমন কি ছিল যে, তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া ত্যাগ-স্বীকারের দৃষ্টান্ত হইতে পারেন? খৃষ্টের এমন কি অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, সামর্থ্য সত্ত্বেও অন্যকৃত অপকার সহ্য করিয়া ক্ষমা-গুণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—অসামর্থ্য-নিবন্ধন সহিষ্ণুতা ক্ষমা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। প্রত্যুত যাহারা তাঁহার মতের দোষোদ্ঘোষণ করিত, তাহাদের সহিত আলাপ ও ব্যবহার কালে তাঁহার দয়া, সৌজন্য ও ভ্রাতৃভাবের বিকট বিপরীত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা মেষের ন্যায় নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, তিনি তাহারদিগকে মেষ ও আপনাকে মেষ-পালক বলিতেন; আর যাহারা তাঁহার অনুগমন করিতে অস্বীকার করিত, তাহারদিগকে শয়তানের সন্তান বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিতেন। দয়া ও ভ্রাতৃভাবের কি এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে? তাঁহার কতকগুলি উপদেশ অবশ্যই সাধু হৃদয়ের আনন্দ-জনক হইবে; কিন্তু তাঁহার চরিত্র কখনই সাধুদর্শীদিগকে প্রীত করিতে পারে না। অন্যত্র যেমন উপদেষ্টা অপেক্ষা উপদেশের মূল্য অধিক হইয়া থাকে, তাঁহার বিষয়েও অবিকল সেই রূপ। সুতরাং তাঁহার কতকগুলি উপদেশকে যে পরিমাণে আদর করা যায়, তাঁহার চরিত্রকে সে পরিমাণে আদর্শ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার সহিত আপনার জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার সামঞ্জস্য বিধানকেই মুক্তি, উন্নতি, ও পরম পুরু-

যার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন; এক মাত্র ঈশ্বরই তাঁহারদিগের আদর্শ হইবেন।

যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে খৃষ্ট অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং সূক্ষ্মতম অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে আদর্শ করিয়া আপনাকে নিয়মিত করিতে অসমর্থ; যদি কেবল তাহারদিগের জন্য খৃষ্টকে আদর্শ করা হয়, তাহাও আমাদের অনুমোদিত হইতে পারে না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রসাদে আমারদের এই সত্যটির উপরে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে এক-নিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরের বিশুদ্ধ-মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া না চলিলে ধর্ম্ম-পথে, কল্যাণ-পথে, অগ্রসর হওয়া যায় না। ঈশ্বরের সহিত যোগ-নিবদ্ধ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য; অতএব তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া কোন পরিমিত বস্তুর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে লাভ করিব? যত ক্ষণ সাধক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইবে, তত ক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাকে উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হইবেন না। ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্য স্থানে একটি ব্যবধান সংস্থাপন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ জ্ঞানময় অশরীরী পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনায় অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া হিন্দু-সমাজের যে অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও সতর্ক ও সাবধান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

মহাত্মা হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক-প্রাপ্তি।

ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা হরদেব চট্টোপাধ্যায় দুশ্চিকিৎস পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া গত শ্রাবণ মাসের চতুর্থ রাত্রিতে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর হইবে। তিনি এই সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া অধিকাংশ কাল কেবল ধর্ম্মের আলোচনাতেই, ঈশ্বরের উপাসনাতেই, পরোপকার সাধনাতেই, অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য অকপট ব্রাহ্ম অতি বিরল। তাঁহার জীবন একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত-স্থল। তিনি এমনি উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন যে যখন পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইয়া আছেন, তখনও ১১ মাঘের উৎসবে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হন। তিনি গত ১১ মাঘে ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া যে একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে এই পাড়াই যে সাংঘাতিক হইবে, তাহার আভাস দিয়াছেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে এই তাঁহার শেষ সভারোহণ, সাধারণের নিকট এই বক্তৃতাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা, ও এই দর্শনই তাঁহার শেষ দর্শন। আমরা আর তাঁহার সেই পবিত্র-ভাব-পরিপূর্ণ মুখ-শ্রী প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহার রসনা-বিনির্গত সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পাইলাম না। তিনি সেই অবধিই জন্মের মত সাধারণের নিকট বিদায় লইয়া গিয়াছেন।

ঐ মহাত্মা মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে আপনার পুত্রদিগকে কহিয়াছিলেন যে আমার মৃত্যু হইলে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে সংবাদ দিবে—পরে তিনি আসিয়া যে রূপ ব্যবস্থা প্রদান করিবেন, তদনুসারে আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া তোমরা সমাহিত করিবে। পিতৃ-ভক্তি-পরায়ণ পুত্রেরা পিতা হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট সেই রাত্রিতেই সমাচার প্রেরণ করেন। তিনি সেই রাত্রি অবসান হইলে পর দিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম-বন্ধুবান্ধবদিগকে সঙ্গে লইয়া চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হন।

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হরদেবের মৃত দেহ পাটল-বর্ণ-বসনে প্রাবৃত হইয়া দ্বার দেশে খট্টার উপর শয়ান রহিয়াছে। আত্মীয় স্বজন সকলেই বিষণ্ণ বদনে স্তব্ধ-ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক অতি যত্ন সহকারে শব রক্ষা করিতেছেন। শবের নিকট ধূপের সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ নির্গত হইতেছে। চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র দীন-নয়নে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত পিতার দেহে শনৈঃ শনৈঃ তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রৌদ্রের সম্পর্ক নাই। তত্রোপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ন্যায় প্রকৃতিও যেন তৎকালে নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিয়া আছে।

অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় হরদেবের মুখ-শ্রীর অবিকৃত ভাব ও পবিত্র ভাবের সুস্পষ্ট চিহ্ন তখনো পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান দেখিয়া কিয়ৎ ক্ষণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে তাঁহার আদেশানুসারে মৃত দেহ সলিল-ক্ষালিত ও পরিষ্কৃত করা হইল। মৃত দেহের উপর কষায় বস্ত্রের পরিবর্ত্তে শ্বেতবর্ণ বস্ত্র নিহিত হইল; ও সেই আচ্ছাদন-বস্ত্রের উপর অভ্র মিশ্রিত আবীর নিক্ষিপ্ত হইল এবং মাল্য চন্দন ও পুষ্প দ্বারা তাহা সুসজ্জিত করা হইল। অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বহস্তে পুষ্প-রাশি তাহার উপরে বিকীর্ণ করিলেন। চট্টোপাধ্যায়ের দুই পুত্র ও জামাতারা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মগণ মৃত দেহের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং শবের শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া বাষ্প-গদ্গদ-বাক্যে এই বক্তৃতা করিলেন।

"যখন এই মহাত্মা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তখন কেহই আমরা ইহাঁকে আহ্বান করি নাই—সে সময় কেহই আমরা পৃথিবীতে ছিলাম না। এখন, যখন ইনি স্বর্গস্থ হইলেন—এখন ইঁহাকে সম্মান করিতে আমরা সকলে এখানে একত্রিত হইয়াছি। যদিও আমারদের মুখ ম্লান, কিন্তু ইঁহার সদ্গতি অনুভব করিয়া আমারদের আত্মা নির্ম্মলানন্দে প্লাবিত হইতেছে। দেখ, ধর্ম্মের কি পুরস্কার। ইনি একাকী ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত এক ধর্ম্মের উদ্দেশে নানা প্রকার ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আত্মাকে নির্ম্মল করিয়াছেন। যত দিন পর্য্যন্ত এই শরীরে ইঁহার আত্মা ছিল, তত দিন এমন দিন যায় নাই, যে দিন ইনি কোন না কোন উপকারের চিন্তা না করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমিক ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত একাকী নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের পথে গমন করিয়া এখন দিব্য-লোকে আনন্দ অনুভব করিতেছেন। ধর্ম্মের পুরস্কার আমরা এখান হইতে কি অনুভব করিব? ইঁহার আত্মা এই ক্ষণে তাহা সম্যক্-রূপে অনুভব করিতেছে। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া এইক্ষণে কিসে এই শরীর পবিত্র পঞ্চ-ভূতে মিশ্রিত হইয়া পবিত্র হয়, ইহাতেই চেষ্টিত আছি। এখানে বন্ধুবর্গ আর কি করিবে? কিন্তু এই ক্ষণে দেবতারা দিব্য-ধামে ইঁহার আত্মাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। মনুষ্য-লোকের আর এক জন সচ্চরিত্র সরল সাধু আত্মাকে লাভ করিয়া দেবতারা প্রহৃষ্ট হইয়াছেন। এই সাধু মহাত্মা কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু শ্যামাপ্রসন্ন! দুর্গাপ্রসন্ন! স্মরণ কর, তোমারদিগকে এক দিনের জন্যও ইনি বিস্মৃত হন নাই। তোমরা হয়তো ইঁহার উপরে কত অত্যাচার করিয়াছ, ইনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক সকলি ক্ষমা করিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য ইনি সকল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তোমারদের মঙ্গল-চিন্তা ইনি এক দিনের নিমিত্তেও বিস্মৃত

হন নাই। তোমারদের যাহাতে শরীর রক্ষা হয়, ধর্ম্ম রক্ষা হয়, আত্মা উন্নত হয়; ইনি এক ঘণ্টাকাল তাহার চিন্তা হইতে আপনাকে বিরত করেন নাই। তেমনি স্বয়ং ঈশ্বর ইঁহার সকল কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। যেমন ইনি ইঁহার আত্মাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ঈশ্বর ইঁহার শরীর ও ইঁহার সকল পরিবারকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। কত দুঃখ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল, এক দিনের জন্যও ইনি বিমর্ষ হন নাই; প্রহৃষ্ট চিত্তে সংসার-ধর্ম্ম চিরকাল পালন করিয়াছেন। কেবল কি তোমারদিগের কল্যাণ-সাধনে ইঁহার সমুদায় যত্নের অবসান হইয়াছিল? কিসে সমুদায় বঙ্গ ভুমি—এই মাতৃ-ভুমি, শ্রী সৌভাগ্যে উন্নত হয়; দিবা রাত্রি এই তাঁর চিন্তা ছিল। এই মহাত্মার সঙ্গে আমার যখন প্রথম আলাপ হয়, তখন তিনি আমার সঙ্গে কি বিষয়ে প্রথমই সম্ভাষণ করেন? এই যে—দামোদরের বন্যাতে জল-প্লাবন হইয়া প্রজা-সকল উচ্ছিন্ন যাইতেছে—কিসে তাহারদের রক্ষা হয়? সেই জল-প্লাবনের দুঃখ দূরের নিমিত্তে প্রথম আমার সঙ্গে ইহাঁর আলাপ। আমার সহিত প্রথম দিনের আলাপে প্রথমেই এই মুখ হইতে বিনির্গত হয়—"জল-প্লাবনে দেশ ভেসে গেল, কিসে প্রজাদের দুঃখ নিবারণ হইবে।" পরের দুঃখ নিবারণ করা ইঁহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল। কিসে লোকের দুঃখ দূর হয়, কিসে লোকেরা বিদ্যাতে ধর্ম্মেতে উন্নত হয়; ইহাতে ইঁহার অপ্রতিহত উৎসাহ ও যত্ন ছিল। কি সহ-মরণ নিবারণে—কি বিধবা-বিবাহে—কি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে—কি ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠাতে, দেশের সকল প্রকার মঙ্গল কার্য্যে ইনি সকলের অগ্রসর ছিলেন। ইনি লোক-ভয়ে ভীত হইতেন না, ইনি লোকের অত্যাচারে অবসন্ন হইতেন না, ইনি ধর্ম্ম-যুদ্ধে কখনো পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। দেখ, অদ্য এখানকার কি বিষণ্ন ভাব—এখন সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে না। এই মেঘাবৃত মলিন নভোমণ্ডল আমারদের অন্তঃকরণের বিষাদ-ভাবের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে—সম্ভ্রমের সহিত এই মৃত-দেহকে ছায়া দান করিয়া রক্ষা করিতেছে। যেমন ইনি এখানে ছিলেন, তেমনি শান্ত ভাবে এখনো ইনি এই শয্যার উপরে শয়ান আছেন। মুখের কিছুই বিকৃতি হয় নাই। ইহাঁর আত্মা হয় তো এখানে এখন সঞ্চরণ করিয়া অমার বাক্য শ্রবণ করিতেছে। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে যে উপদেশ আছে, আমি তাহা পাঠ করি; দেখ দেখি, ইহার সঙ্গে এই সাধুর জীবন মেলে কি না? "ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" "গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন্ কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।" দেখ, এই কথা ইহাঁর জীবনের সঙ্গে কেমন মিলে। আবার দেখ, "মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।" "গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।" ইঁহার পিতামাতার প্রতি ভক্তি ইঁহার মুখ হইতে কত বার শুনিয়াছি, আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস, ইঁহার মত পিতৃ-ভক্ত সৎপুত্র পৃথিবীতে অতি দুর্ল্লভ। "গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ।" "সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু।" ইনি প্রতিদিন মাতার পদ পূজা করিতেন। মাতার মৃত্যুর সময় হইতেই ইহাঁর তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল।

ইনি ভাবিলেন, মা কোথা? এই শরীর কি মা? শরীর তো ভস্মান্ত হইল, তাহা তো এই জলেতে, বায়ুতে, মিলিয়া গেল। তবে মা কোথা? এই প্রশ্নে ইহাঁর আত্ম-জ্ঞান জন্মিল। মাতা শরীর না, কিন্তু মাতার শরীরের মধ্যে যে জীবাত্মা, তিনিই আমার মাতা। এই প্রকারে প্রথম ইহাঁর আত্ম-জ্ঞান জন্মিল। অন্য লোকে কত তর্ক-শাস্ত্র দর্শন-শাস্ত্র পড়িয়া যাহা বুঝিতে পারে না, ইনি স্বীয় সরল-হৃদয়ের এক-ভক্তি-বলে মৃত মাতার নিকট হইতে আত্ম-জ্ঞান লাভ করিলেন। ইঁহার পৈতৃক ধর্ম্ম শাক্ত ধর্ম্ম ছিল, ইনিও প্রথম বয়সে শক্তি-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে কালী-মূর্ত্তি দুর্গা-মূর্ত্তি কিছুই নহে, আত্মাই সত্য এবং লোকের উপকারই ঈশ্বর-পূজার নৈবেদ্য—অতএব ইনি প্রাণপণে পরোপকারে আপনার শরীর ও মনকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি যখন যে সত্য জানিতেন, তদনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন। ইনি একটী সত্য-পালনের জন্য ইহাঁর পৈতৃক নিবাস-বাটী পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইলেন। ইহাঁর নিকটে বিষয় এমনি তুচ্ছ ছিল, যে পিতৃ-ভূমি ছোট ভ্রাতাকে দিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া আইলেন। ইনি ত্যাগ করিতে যান, ঈশ্বর ইহাঁর সকল অভাব দূর করেন। ইনি পিত্রালয় পরিত্যাগ করিলেন, ঈশ্বর ইহাঁকে এই গৃহে স্থাপন করিলেন। এই গৃহ পুত্র-পৌত্রে, দুহিতা-দৌহিত্রে, ধন-ধান্যে, পূর্ণ হইল। ইহাঁর পুত্র-সকল কর্ম্মক্ষম, কন্যারা সুশীলা। যথার্থ ধর্ম্মের পুরস্কার ইহাঁর আত্মা বুঝিতেছে। মৃত মাতার আত্মাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া ইঁহার আত্ম-তত্ত্বের জ্ঞান হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশে ইঁহার ব্রহ্ম-তত্ত্বের লাভ হইল। ইনি সাধারণ অদ্বৈত-বাদীদিগের মতের অনুসরণ করিয়া অনেক দিন এই শরীর-স্থিত আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করিতেন। পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শ্রুতিটি শ্রবণ করিয়া ইহাঁর সে ভ্রম দূরীকৃত হইল এবং স্বীয় আত্মা অপেক্ষা সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিদুঃ।" "ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা আত্ম-রূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।" ইনি এই শ্রুতিটি আলোচনা করিয়া নিশ্চয়-রূপে প্রতীতি করিলেন যে এই শরীর-স্থিত আত্মা ব্রহ্ম নহে, যেহেতু ইহা জ্ঞান-ধর্ম্মে পরিমিত; কিন্তু এই আত্মার আশ্রয় হইয়া যিনি এই আত্মার অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তিনিই অনন্ত—তিনিই ব্রহ্ম। ইনি স্বরচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতে এই সার সত্যটি কি সহজেই প্রকাশ করিয়াছেন—"যেমন দেহ অন্তরে, এ আত্মা সদা বিহরে, সে রূপ তার অন্তরে, ব্যাপ্ত পরাৎপর।" এই শরীর-স্থিত পরিমিত আত্মার মধ্যে সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মকে লাভ করিয়া ইনি জ্ঞান-তৃপ্ত ও কৃত-কৃতার্থ হইলেন—ইহাঁর মুখ সমুজ্জ্বলিত হইল। দেখ ইহাঁর এই মুখ-শ্রী—ইহার প্রশান্ত ভাব এখন কাহাকে না আকর্ষণ করিতেছে? হে পরমাত্মন্! আমারদের ধর্ম্মের গতি যেন এই মহাত্মার ন্যায় হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

অনন্তর শব-বাহকেরা শ্মশানে শব লইয়া চলিল। তাঁহার মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং অন্যান্য সকলেই দুঃখ-শোকে অভিভূত হইয়া শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মৃত দেহ শ্মশানে উপনীত

হইল। পরে হরদেবের উক্ত পুত্র-দ্বয় ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে অগ্নি স্থাপনা করিলেন। দাহক ও বাহকেরা ঘৃত চন্দনে সুবাসিত করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিল। অগ্নি উগ্রভাবে শিখা-জাল বিস্তার করিয়া অবিলম্বে মৃত দেহ বিলুপ্ত করিল। দেহ পবিত্র পঞ্চভুতে বিলীন হইলে হরদেবের ঐ পুত্র-দ্বয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পরলোকে পিতার আত্মার উন্নতির নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এই রূপে ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে অন্ত্যেষ্টি সমাহিত হইলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং হরদেবের পুত্রদ্বয়ও আপনারদের কুলাচারের অনুরূপ শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা পিত্রালয়ে এবং মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভর্ত্তৃ-গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁরা চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে চতুর্থী করিয়াছেন। যাঁহারা ভর্ত্তৃ-গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা সেই দিবস বহু-সংখ্য নিরন্ন ও বস্ত্রহীন ব্যক্তিদিগকে অন্ন ও বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

পরে একাদশ দিবসে ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ সমাহিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ কালে হরদেবের আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য ব্রাহ্ম অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী আচার্য্য-আসন গ্রহণ করিয়া এই পারত্রিক-সাধন শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম অতি পবিত্র-ভাবে সুসম্পন্ন করেন। প্রথমে ব্রহ্মোপাসনা হয়। তৎপরে হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার পিতার সদ্গতির নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। শেষে ব্রহ্ম-সঙ্গীত হয়। এই রূপে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল।

(FROM THE NATIONAL PAPER.)

Our worthy writer on Christianity (II.) in common with the orthodox writers on the subject has deduced the necessity of a Revelation from the fact or rather the supposed fact of our fallen and corrupt nature. Indeed, there has scarcely been any system of religion in the world which, did not claim Divine revelation on the ground of such or similar presumption. The Koran, the Veds, the Zenda Vesta and Adi Grantha, the Institute of Menu and Laws of Lycurgus have one and all professed to be the works of God himself. The Bible, therefore is not unique in its pretensions as to its divine origin. The universality of the fact, in truth cannot be gainsaid. Man feels that he wants religious enlightenment, and has in all ages looked heavenward for guidance and support. There is a universal craving in humanity on the one hand, and a general belief of its satisfaction on the other; and this is the more confirmed by our observation of the arrangements made by Providence for the supply and gratification of our inferior wants and appetites. But though mankind have always stood in its need, and its influence upon and connection with the spiritual wellbeing of our race has been generally appreciated and discussed in polemical theology, few subjects have been more differently understood and frequently mis-understood than the nature, mode and scope of Revelation. We therefore make no apology in offering our remarks at some length upon this important subject.

The question which we have to solve in the threshold of our enquiry is what do we mean by Revelation. Revelation in its general sense, implies communication of knowledge, in its special sense, of religious knowledge by God to man. It evidently presupposes a mode or a process of intelligence as its condition. Now there are only two modes of intelligence possible to man in the present state of things, the intuitional and the logical. Revelation, undoubtedly belongs to the former category; for the characteristics of Intuition are the same as those universally ascribed to Revelation. To the

possibility of Intuition it is necessary that truths be immediately presented to our consciousness, which are unattainable either by experience or reasoning, and which therefore must be referred to the Source of all things. Now this is exactly predicable of Revelation. Direct presentation of truths to our minds by the agency of God holds true as well of Intuition as of Revelation. Again the knowledge we derive from Intuitional consciousness is *material* and that which we obtain from the reflective, is formal. The province of the former is to furnish us with facts and materials, that of the latter is to define, classify and annalize them. The object of the former is to enlarge the horizon of our mental vision, to widen the circle of our knowledge, that of the latter is to ascertain that the relation between our ideas, to give clearness and distinctness to our conception. The former forms the basis upon which the vast superstructure of science is raised; the latter gives form to the whole and symetry to the parts. The former leads to unity; the latter to division. In short Logic never enables us to apprehend original truths as Intuition does. Logic, being then incompatible with any discovery of truth, clashes with our notion of Revelation whose primary object is as has been already said, the presentation to our consciousness of such facts or truths as cannot be obtained by our own ingenuity. Revelation and Intuition, therefore are one and the same thing. They are only two names signifying one identical thing.

If the reasonings employed above, be correct a book, in as much as it is an external thing and not a mode of our intuitive conciousness, and addressing itself as it does to our intellectual and critical faculties cannot with any propriety be called revelation, But though not itself a revelation we do not deny it may contain such truths as may have been revealed to the writer thereof and are calculated to awaken and elevate our religious consciousness. But if it is possible for a book to contain truths of this sort, there is no reason for crediting the Bible alone with being their sole repository. Indeed, the Koran of the Mahomedan, the Veds of the Hindoos, the Zenda Vesta of the Parsees all contain innumerable truths which chime in with the intuitive cognitions of our mind and must on that account be reckoned as having been revealed to the respective writers thereof. So that, look to the question in what light you may, consciousness must in the nature of the thing be acknowledged to be the ultimate standard by which the claims of Revelation should be tested. It must be held competent to judge of a professed revelation, to accept that portion of it which tallies with its dictates and reject that which jars with its voice. Any *authoritative* external revelation which presumes to transcend its verdict is, therefore, impossible nay inconceivable. To say that our mental faculties are mendacious and untrustworthy, that our nature is corrupt and debased is suicidal to the doctrine of Revelation. For in that case the proof, the arguments and the appeals in support of the doctrine must needs be rejected as proposed to a mind that is false, and a nature that is corrupt. In connection with the subject of the infallibility of the Bible, of which so much has been said by Christian writers, it may be here, briefly mentioned that, supposing the truth of the alleged fact were proved to our satisfaction, which, however, is far from being the case, it is of no avail so far as the attainment of religious certitude is concerned. Of what earthly use, we ask in the name of common sense, would then an infallible book be, when the mind by which it is to be interpreted and understood is after all fallible. Man as man must always be subject to error and mistake, whatever book he may chose for his religious guidance. History abundantly testifies to the truth of this statement. The numberless sects into which the whole of Christiandom has been pulverized are an abiding proof of the truth of our assertion.

We have not space enough to enlarge upon the topic of the authenticity and credibility of the writings of the Bible. We will dismiss the subject for the present with a few remarks of the impractibility of converting History into Religion. Religion, there is no doubt, is in history, and in what science it is not, but history is not religion. As the records of the past History no doubt relates the most important and public events with tolerable certainty, but as to the minute details a large margin should be left aside for mere probabilities. It is said of the celebrated Sir. Walter Releigh (when he was writing the History of the World) that he "heard the

noise of a violent contention under his window, whence he could neither see nor hear distinctly. Of one person after another as each entered his appartment he made enquiries concerning the disturbance but so inconsistent were the several accounts, that he was unable to trace the truth. What said he can I not make myself master of an incident that happened an hour ago under my own window and shall I imagine I can truely understand the history of Hannibal and Cæsar." Moreover the faculties concerned in the pursuit of historical knowledge are the intellectual and the critical. To study, to collate and sift texts and passages, these are the business of an historian. Were History therefore religion, the intellect would be the all and end all of our existence and the soul left uncultivated and uncared for. The scholar and the Logician would then enjoy all the fruits of religion and not the lowly and the faithful in heart. But such a monstrous conclusion no one in his wits would, we think, be prepared to admit. Our idea of religion is, that common as the air, it blesses as well the learned as the ignorant—it blesses as well the hut of the poor as the palace of the rich. But the above conclusion, however absurd, one would naturally come to if History were converted into Religion.

Again does the assumption that History is religion simplify any of the problems of rili-gion ; does it enable us to found religion on a sure and certain bassis ; does it remove difficulties from the path of our Religious enquiry —far from it. In the historical sense of religion (if there is any logic at all in the words historical religion) one could hardly be said to possess a grain of religion in his composition unless he had previously solved the army of difficulties—difficulties as to the authenticity and credibility, the age and authorship of the Books—difficulties as to the miracles and prophecies—difficulties as to the scientific accuracy of the narratives—difficulties as to the theology deducible from them and many others which one in a thousand can hardly be expected to master.

From these reasons it is clear that History can never be the source of religious knowledge. Let us therefore get quite of the false position at once for ever, and trust in the still small voice within, the perennial Revelation of God in the deep recesses of our hearts. Such a revelation is Common and Catholic as human nature itself. It is limited neither to time, nor place nor creed nor color. Wherever the sprit of man holds communion with hte spirit of God and gets hold of some truths it knows not how, there it is. It comes to our mind not supernaturally but in accordance to the laws of Spirit.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ২১ আশ্বিন শনি বার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে একাদশং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৯০

৬। নকিষ্ট্বদ্রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে। নকিষ্ট্বানু মজ্মনা নকিঃ স্বশ্ব আনশে।

৬। হে 'ইন্দ্র' 'যৎ' যস্মাৎ ত্বং 'হরী' এতৎসংজ্ঞৌ অশ্বৌ 'যচ্ছসে' রথে যোজয়সি তস্মাৎ ত্বত্তোঽন্যঃ কশ্চিৎ 'রথী-তরঃ' অতিশয়েন রথবান্ 'নকিঃ' নাস্তি। অন্যেষাং ঈদৃক্ অশ্বযুক্তরথাভাবাৎ। 'ত্বা' ত্বাং অনুলক্ষ্য 'মজ্মনা' বলনামৈতৎ। বলেন ত্বৎসদৃশোঽপি 'নকিঃ' নহি অস্তি। 'স্বশ্বঃ' শোভনাশ্বোঽন্যশ্চ ত্বাং 'নকিঃ আনশে' ন প্রাপ। ইন্দ্রস্য বলাশ্বয়োঃ অসাধারণত্বাৎ ইন্দ্রসদৃশোবলবান্ অশ্ববান্ লোকে কশ্চিদপি নাস্তীত্যর্থঃ।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি হরি নামক দুই অশ্বকে রথে যোজিত করিয়া থাক, এই হেতু তোমা অপেক্ষা আর কেহ রথী নাই এবং তোমা অপেক্ষা কেহ বলবানও নাই। যাহা-দিগের উৎকৃষ্ট অশ্ব আছে, তাহাদের অশ্ব তোমার অশ্বের তুল্য নহে।

৮৯১

উষ্ণিক্‌ছন্দঃ

৭। যএক ইদ্বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে। ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ।

৭। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'এক ইৎ' একএব 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে 'মর্ত্তায়' মনুষ্যায় যজমানায় 'বসু' ধনং 'বিদয়তে' বিশে-ষেণ দদাতি। অঙ্গেতি ক্ষিপ্রনাম। 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পরৈঃ অপ্রতিশব্দিতঃ প্রতিকূলশব্দরহিতইত্যর্থঃ। এবম্ভূতঃ সঃ 'ইন্দ্রঃ' ক্ষিপ্রং 'ঈশানঃ' সর্ব্বস্য জগতঃ স্বামী ভবতি।

৭। যিনি একাকীই যজ্ঞশীল ব্যক্তিকে অবিলম্বে ধন দান করিয়াথাকেন, সেই অদ্বিতীয় ইন্দ্র সমস্ত জগতেরই অধিপতি।

৮৯২

৮। কদা মর্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ। কদা নঃ শুশ্রবদ্গির ইন্দ্রো অঙ্গ।

৮। 'অরাধসং' হবির্লক্ষণেন রাধসা ধনেন রহিতং অযষ্টারং ইত্যর্থঃ। এবম্বিধং 'মর্ত্তং' মনুষ্যং ইন্দ্রঃ 'পদা' পাদেন 'ক্ষুম্পং ইব' অহিচ্ছত্রকমিব 'কদা' 'স্ফুরৎ' স্ফুরিষ্যতি বাধিষ্যতি। যথাহি ছত্রকং বলনাকারেণ পদা অনায়াসেন হন্তি এবং ইন্দ্রোঽপি কদা... বনি-ষ্যতীত্যর্থঃ। স্ফুরৎ। স্ফুরতির্বধকর্ম্মা স্ফুরতি স্ফুলতীতি বধকর্ম্মসু পঠিতত্বাৎ। 'নঃ' অস্মাকং ষষ্ঠ্যর্থে...

'গিরঃ' স্তুতিলক্ষণা বাচঃ 'ইন্দ্রঃ' 'কদা' কস্মিন কালে 'অঙ্গ' ক্ষিপ্রং 'শ্রবৎ' শ্রোষ্যতি ইতি বিতর্কতে। কদা মর্ত্তং অনারাধযন্তং পাদেন ক্ষুম্প মিব অবস্ফুরিষ্যতি কদা মঃ শ্রোষ্যতি গিরঃ ইন্দ্রোহঙ্গ।

৮। যাহারা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না এই রূপ ব্যক্তিকে অহিচ্ছত্রের ন্যায় ইন্দ্র পদাঘাতে কবে বিনাশ করিবেন এবং কবেই বা আমারদিগের স্তুতি বাক্য শ্রবণ করিবেন।

৮৯৩

৯। যশ্চিদ্ধি ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আবিবাসতি। উগ্রং তৎপত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ।

৯। 'বহুভ্যঃ' মনুষ্যেভ্যঃ সকাশাৎ 'যঃ' 'চিৎ' 'হি' যএব খলু যজমানঃ 'সুতাবান' অভিষুতসোমযুক্তঃ সন্ হে ইন্দ্র 'ত্বা' ত্বাং 'আবিবাসতি' পরিচরতি। বিবাসতিঃ পরিচরণকর্ম্মা। 'তৎ' তস্মৈ যজমানায যৎ 'উগ্রং' উদগূর্ণং 'শবঃ' বলং 'ইন্দ্রঃ' 'অঙ্গ' ক্ষিপ্রং 'পত্যতে' পাতযতি প্রাপযতি।

৯। বহু মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি সোম রস দ্বারা ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করে, ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে অবিলম্বে প্রভূত বল প্রদান করিয়াথাকেন।

৮৯৪

পংক্তিশ্ছন্দঃ

১০। স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্য্যঃ। যা ইন্দ্রেণ সযাবরী বৃষ্ণা মদন্তি শোভসে বস্বীরনু স্বরাজ্যং। ১। ৬। ৬।

১০। 'স্বাদোঃ' স্বাদুভূতস্য রসযুক্তস্য 'ইত্থা' 'বিষূবতঃ' ইত্থং অনেন প্রকারেণ সর্ব্বযজ্ঞেষু ব্যাপ্তিযুক্তস্য 'মধ্বঃ' মধুররসস্য সোমস্য। এবম্বিধং সোমং 'গৌর্য্যঃ' গৌরবর্ণা গাবঃ 'পিবন্তি'। 'যা' গাবঃ 'শোভসে' শোভার্থং 'বৃষ্ণা' কামাভিবর্ষকেণ ইন্দ্রেণ 'সযাবরী' সহ যান্ত্যঃ গচ্ছন্ত্যঃ সত্যঃ 'মদন্তি' হৃষ্টা ভবন্তি। তা ইন্দ্রপীতস্য সোমস্য শেষং পিবন্তীত্যর্থঃ। 'বস্বীঃ' পযঃপ্রদানেন নিবাসকারিণ্যস্তা গাবঃ 'স্বরাজ্যং' স্বস্য স্বকীয়স্য ইন্দ্রস্য যৎ রাজ্যং রাজত্বং তদনুলক্ষ্যাবস্থিতা ইতি শেষঃ। ১। ৬। ৬।

১০। যাহারা শোভার্থ অভিলষিত ফলপ্রদ ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়া আনন্দিত হয়, সেই সমস্ত গৌরবর্ণ ধেনু সুস্বাদু সুমধুর সর্ব্বযজ্ঞোপযোগী সোমরস পান করিয়া থাকে এবং যাহারা দুগ্ধ প্রদান পূর্ব্বক অন্যের আশ্রয়ে বাস করিয়া থাকে, সেই সমস্ত ধেনু ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করে। ১। ৬। ৬।

শরচ্চন্দ্রালোকে ব্রহ্মোপাসনা।

বাহিরে শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের উদয়; ভিতরে সেই প্রেম পূর্ণচন্দ্রের উদয়। সেই প্রেম-পূর্ণ চন্দ্রকে দর্শন করিলে রোগ, শোক, বিষাদ কোথায় পলায়ন করে। সেই ব্যক্তি যথার্থ শূর, যিনি সাংসারিক বিপদকে অতিক্রম করিয়া সেই সুধাংশুর জ্যোতিতে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করেন। বাহিরে পূর্ণ চন্দ্র ইতি পূর্ব্বেই রাহু-গ্রস্ত হইয়া মলিন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া নবজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়াছে। সেই রূপ আমাদের আত্মা কখন কখন পাপ-রাহু-গ্রস্ত হইয়া মলিন হয়, পুনর্ব্বার ঈশ্বর-প্রসাদে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়। সাবধান, যেন পাপ-রাহু দ্বারা আমাদের আত্মা আক্রান্ত না হয়। সংসারের সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুখ দুঃখ আমাদের অধীন নহে; কিন্তু আমাদিগের আত্মা আমাদিগের অধীন। আমাদের আত্মাকে হয় আমরা পবিত্র রাখিতে পারি, কিম্বা পাপ-পঙ্কে কলঙ্কিত করিতে পারি। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান থাকে, সেই রূপ আমাদিগের আত্মা সেই পরমাত্মার আলোকে উজ্জ্বল হয়, নতুবা ঘোর অন্ধকারে

আচ্ছন্ন থাকে। যতক্ষণ পাপরূপ রাহু সেই আলোকের বিচ্ছেদ সাধন করে, ততক্ষণ আমাদের আত্মা নিষ্প্রভ থাকে। পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইলেই ঈশ্বরের আলোক পাইয়া আমরা কৃতার্থ হই। আমরা যেন সর্ব্বদা এই চেষ্টা করি যে যেমন মনুষ্য এই শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিতে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ লাভ করে, সেই রূপ আমরা সেই আধ্যাত্মিক প্রেম-শশির কিরণে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া তদপেক্ষা অসংখ্য-গুণে শ্রেষ্ঠতর আনন্দ উপভোগ করি।

থিওডোর পার্কর।

২৭৭ সংখ্যক পত্রিকার ১১৭ পৃষ্ঠার পর।

মানব জাতির অন্তরে যে ধর্ম্ম-ভাব নিহিত আছে, তাহার বৈধ কার্য্যই ঈশ্বরানুরাগ উৎপন্ন করিয়া দেয়। এক সময়ে এই অনুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আশা ও প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে; এই রূপ কার্য্যই ইহার প্রাকৃতিক। আর এক সময়ে এই অনুরাগ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ, ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিয়া থাকে; এই রূপ কার্য্য ইহার অপ্রাকৃতিক। এই রূপে যখন ইহা মনুষ্যের জ্ঞান ও পবিত্রতা বা অজ্ঞান ও অপবিত্রতার সহিত অবস্থান করে, তখন ইহার উন্নতি বা অবনতি উপস্থিত হয়। যাহাই হউক, যদি সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বিশ্বাস ও প্রীতি মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম-ভাবের বৈধ ও প্রাকৃতিক কার্য্য হইতে যে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। যেমন দেশ ও কাল একই প্রকার, সেই রূপ ধর্ম্মেরও প্রকারান্তর নাই। প্রীতি বা ঘৃণা, জ্ঞান বা অজ্ঞানতা, ইহার অন্যতর পক্ষের সহিত সংযুক্ত হইলেই উহা সবল বা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। যেমন প্রীতি পদার্থ স্বয়ং অবিকৃত; কিন্তু প্রয়োক্তা ও প্রয়োজ্যের স্বভাবানুসারে উহার বাহ্য বিকার লক্ষিত হয়, সেই রূপ মনুষ্যের স্বভাবানুসারে ধর্ম্মও বাহ্যে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্ম যখন একই পদার্থ হইল, তখন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম ও প্রাকৃতিক ধর্ম্মের শব্দগত বৈ বস্তুগত কোন বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে না। প্রাকৃতিক ধর্ম্মকে অবশ্যই প্রত্যাদেশ-লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা সে ধর্ম্ম কদাচ অনুভব করা যাইতে পারা যায় না এবং প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম অবশ্যই প্রাকৃতিক, নতুবা তাহা কোন ব্যবহারেই আসিতে পারে না। যা কিছু মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে, তাহা তাহার জ্ঞানের অণুমাত্র বহির্ভূত নয়। আমরা এই একমাত্র ধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন ও আমাদিগের একতর পক্ষপাতী সংক্ষিপ্ত অনুভবকেই অনুরূপ এক একটি নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করি এবং এই জন্যই এই প্রাকৃতিক প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মকে অদ্বৈতবাদ-নিষ্ঠ, দ্বৈতবাদাত্মক, পৌত্তলিক, ইহুদীয়, খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্ম বলিয়া থাকি; কিন্তু নাম দ্বারা যে স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাহা চিন্তার বিষয়ীভূত ধর্ম্মের নয়, যিনি চিন্তা করিতেছেন উহা তাঁহার মনেরই। ইতিহাসে ধর্ম্মের বাহ্য আকার নানা প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে কোন কোন ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ও সুন্দর এবং কতগুলি বিজাতীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভক্তি ভাবকে এক কালে কলুষিত করিয়া দিতেছে।

সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ইতিহাসে ধর্ম্মের যে বিবিধ আকার দৃষ্ট

হয়, তৎসমুদায়ের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রশ্মি-জাল একটি বিন্দু মধ্যে সংগ্রহ করিয়া তাহার নাম সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না; কারণ আমরা বহু সংখ্য অসম্পূর্ণ অঙ্গহীন দৃশ্য হইতে একটি পূর্ণাবয়ব সঙ্কলন করিতে কিছুতেই সমর্থ নহি। কিন্তু দেখিতেছি যখন আমরা এই রূপ অনুসন্ধান দ্বারা বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম হইতে প্রকৃত সত্য পূর্ণ ধর্ম্ম সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা অগ্রেই আমারদিগের অন্তরে এই সমস্ত ধর্ম্ম বিচার করিয়া লইবার যে একটি প্রকৃত সত্য-ভাব আছে, যাহা নিকষোপলের ন্যায় সমস্ত পরীক্ষা করিয়া লয়, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। নিকষোপলের ন্যায় এই প্রকৃত সত্য-ভাব না থাকিলে আমরা কিছুতেই ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না। সুতরাং প্রকৃত পূর্ণ ধর্ম্ম আমাদের অভ্যন্তরেই রহিয়াছে। বাহ্যে তাহা সঙ্কলন করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা সেই অন্তর্নিহিত সত্য-ভাব হইতেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া তাহাতেই শেষ করিয়া থাকি। পূর্ণ ধর্ম্ম যে আমাদের অন্তরেই রহিয়াছে, ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে আমাদিগের ধর্ম্মজ্ঞানের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে ঐশিক নিয়মের অধীনতাই ধর্ম্ম। ঈশ্বর আমাদিগের প্রকৃতিতে যে সমস্ত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন, সহজ জ্ঞান, জ্ঞান, বিবেক ও ধর্ম্মভাবে যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, কায়মনে তৎসমুদায়ের অধীনতা স্বীকারই ধর্ম্ম। আমরা এই অধীনতা প্রভাবেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ অনুরাগ, বিশ্বাস ও প্রীতির পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। যে অল্পবয়স্ক বালক কর্ত্তব্য ও ইচ্ছাকে একই পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করে এবং এই উভয়ের বিরুদ্ধভাব অনুধাবন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, এই অধীনতা তাহার অপরিজ্ঞাত থাকে। কিন্তু যিনি ইচ্ছা মাত্রকেই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং ঈশ্বরের প্রকৃত নিয়ম অনুসন্ধানে যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট এই অধীনতা সম্পূর্ণ অনুভূত হয় সন্দেহ নাই।

মনুষ্যের ধর্ম্মসংক্রান্ত দুই প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি চিন্তার ভাব; ইহার প্রভাবেই মনুষ্য ধর্ম্ম, ঈশ্বর, ধর্ম্মপ্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ এই কএকটি বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এই ভাবের ফল ধর্ম্মশাস্ত্র; এই ধর্ম্মশাস্ত্রকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, ইহাতে কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে মনুষ্যের ভাব আছে, ইহাকে স্বর্গীয় পদার্থের বিজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনুষ্যের মনই ইহার ক্ষেত্র। জ্যোতিষ ও গ্রহ নক্ষত্রাদি যেমন পরস্পর স্বতন্ত্র, সেই রূপ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয়ই পৃথক পদার্থ। ধর্ম্ম নিত্যকাল একই প্রকার থাকিবে কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র সময়ে সময়ে পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের সহিত অনেক গুলি মতের বিলক্ষণ সংস্রব আছে বটে কিন্তু ধর্ম্ম কদাচই তৎ সমুদায়ের উপর নির্ভর করে না।

দ্বিতীয়টি কার্য্যের ভাব; মনুষ্য ইহার প্রভাবে ধর্ম্মের বশম্বদ হইয়া বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই ভাবের ফল নীতি। এই নীতি স্বয়ং ধর্ম্ম নহে কিন্তু ইহা ধর্ম্মের জীবন। কেহ কেহ এই রূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে নীতির সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রবই নাই। মনুষ্যের অন্তরে নীতি ও ধর্ম্মের বীজ যে স্বতন্ত্র আছে, ব্যবচ্ছেদ দ্বারা তাহা

সুস্পষ্টই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। নীতি ঐশিক নিয়মের সহিত মানবীয় কার্য্যের একটি সংযোগ বিধান করিয়া দিতেছে। ইহা ধর্ম্মের একটি চিহ্ন। যেমন জ্ঞান প্রীতিকে প্রকাশ করিয়া দেয়, সেই রূপ প্রকৃত নীতি ধর্ম্মকে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত করিয়াথাকে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি ধর্ম্মের প্রাণ এবং নীতি ও স্বজাতির প্রতি প্রীতি ইহার আকার। সুতরাং নীতি ও ধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। কোন কোন অভিজ্ঞ লোক এরূপও কহিতে পারেন যে বিচার-চতুর মহাত্মারা ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তির ভাব অনুভব না করিয়াই নিঃস্বার্থ ও বিষদ ভাবে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন। মনুষ্য ধর্ম্মশীল না হইয়াই অনেকাংশে নীতি-পরায়ণ হইতে পারেন বটে কিন্তু নীতি-নিরত না হইলে কদাচ ধার্ম্মিক বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারেন না। যে মহাত্মার গুণে সকলকে মোহিত হইতে হয়, প্রাণ ও দেহের ন্যায় ধর্ম্ম ও নীতি তাঁহার নিকট কার্য্যকালে কদাচই বিচ্ছিন্ন থাকে না। যিনি কেবল নীতি-পরায়ণ, তিনি আপনার প্রকৃতিতে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত কর্ত্তব্যের নিয়মকে যথোচিত সমাদর করেন কিন্তু ঐ নিয়মকে আদর করিয়াও নিয়ন্তার প্রতি কিছু মাত্র আস্থা প্রদর্শন করেন না। কিন্তু ধর্ম্মশীল মনুষ্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ইচ্ছা বলিয়া ঐ নিয়মকে আদরের সহিত প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এক জন কেবল নিয়ম লইয়াই আর এক জন কেবল নিয়ন্তাকে লইয়াই যার পর নাই আরাম প্রাপ্ত হন।

একটি ধর্ম্ম সকল মনুষ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এক ব্যক্তির যেরূপ ধর্ম্ম অন্য ব্যক্তির তাহারই অনুরূপ আর একটি আছে এপ্রকার নয়, কিন্তু একের যাহা আছে অন্যের তাহাই বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মের এক বা বহু সংখ্য উপাস্য বস্তুতে নিয়োগ এবং জাতি ও ব্যক্তিগত উহার তারতম্য এই উভয় দ্বারাই উহার ভেদ লক্ষিত হয় বস্তুত উহার স্বরূপ-গত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। ধর্ম্মের জাতি ও ব্যক্তি-গত তারতম্য এবং এক বা বহু সংখ্য উপাস্য বস্তুতে নিয়োগ ইহাও আবার বাহ্য অবস্থা প্রভাবেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। যখন মনুষ্যের সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন, তখন তাহাদিগের ধর্ম্ম যে উপাস্য পদার্থের স্বরূপ ও সংখ্যানুসারে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন মত, ঐ সকল উপাস্য পদার্থের উপাসনা ও তৃপ্তি সম্পাদনার্থ নানা প্রকার অধিকার, প্রণালী ও বিধি সহকৃত হইবে এবং মনুষ্যের জীবন ও চরিত্রের ফলগত বৈষম্য সম্পাদন করিবে, তাহার আর বৈচিত্র্য কি। সকল মনুষ্যের প্রকৃতি এক রূপ হইলেও যেমন দুইটি জাতি ও দুইটি কাল উহাদের চরিত্র, অবস্থা ও উন্নতি সমান রূপ অধিকার করিতে পারে না, সেই রূপ ধর্ম্মের উপাদান যদিও সাধারণের এক রূপ, তথাচ দুই জাতি ও দুই কালে ইহার কার্য্য কদাচ তুল্য রূপ দৃষ্টিগোচর হইবে না। আমরা স্থির চিত্তে অনুধ্যান করিলে দেখিতে পাই যে, দুইটি মনুষ্য চরিত্র, অবস্থা ও উন্নতি বিষয়ে কদাচই সমান নহে, সুতরাং ঐ দুই ব্যক্তি যদি এক দেবতার সন্নিধানে বাস্পাকুল-লোচনে ভক্তিভাবে প্রণত হয় এবং উহারা যদি ধর্ম্মের একই প্রকার মত স্বীকার করে, তথাচ উহারা ধর্ম্মকে এক আকারে কদাচই প্রদর্শন করিতে পারিবে না। এক্ষণে মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর এই রূপ বিভিন্নতা দেখিয়া সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে যাহারা

ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তা করে এবং আপনাদিগের কার্য্যে ভাব ও চিন্তার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে, এই রূপ যতগুলি স্ত্রী ও পুরুষ আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রকার ঈশ্বরের ভাব ও বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের আকার থাকিবে। যদিও এক ধর্ম্ম প্রত্যেক মনুষ্যে নিরবচ্ছিন্নই আছে, তথাচ ধর্ম্মের মত, ধর্ম্মের আকার, উপাসনা প্রণালী এবং ধর্ম্মের কার্য্য যাহাকে নীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তৎসমুদায়, যে দুই ব্যক্তি এক জননীর গর্ভসম্ভূত ও একই প্রকারে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সেই দুই ব্যক্তিতেও কদাচই সমান হইবে না। আমরা ঈশ্বরের ভাব যে রূপে গ্রহণ করি এবং ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ ও এই সম্বন্ধ হইতে যে কর্ত্তব্য উপলব্ধি করি এই সমস্ত আমাদিগের চিন্তা, ভাব ও জীবনের অভিব্যঞ্জক। ব্যক্তি জাতি ও কালের যে উন্নতির সমষ্টি, ঐ সমস্তই তাহার পরিমাণ করিয়া দেয়। সুতরাং এক্ষণে ইহাই নির্ণীত হইল যে বিজ্ঞান ও শিল্পের ন্যায় ধর্ম্মের বাহ্য দৃশ্যও প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক কালে মনুষ্যের অবস্থানুসারে বিভিন্ন প্রকার হয়। নবজিলণ্ডে প্রথম শতাব্দীতে উহা এক রূপ এবং আমেরিকায় ঊনষষ্টি শতাব্দীতে অবশ্যই অন্য রূপ হইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিকট উহা এক প্রকার ও অনক্ষর মূর্খের নিকট অন্য প্রকার হইবে। অধিক কি এক ব্যক্তিতেই জ্ঞান, সদ্ভাব ও স্বভাবানুসারে উহা বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করিবে। একটি বালকের ধর্ম্ম ও একটি বৃদ্ধের ধর্ম্ম পরস্পর কেমন অনৈক্য বোধ হয়! একটি বালকের প্রার্থনা একটি যুবক বা বৃদ্ধকে কদাচই বিচলিত করিতে পারে না।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬৮ পৃষ্ঠার পর।

একটি আবশ্যক প্রস্তাব অবশিষ্ট আছে। আত্ম সমুন্নতির পরম উপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনো অস্পৃষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় উপায়ই এই মহান্ উপায়ের আশ্রিত। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে সকলই অসার হইয়া পড়ে। এরূপ আখ্যানে অনেকে এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, যে "পূর্ব্বে আত্মোৎকর্ষ বিধানের দৃঢ় সংকল্পকে উহার সর্ব্ব প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমুদায় উপায়ের আশ্রয় বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?" তাঁহাদের এ আপত্তি আপাতত স্থান পায় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলেই ইহার মীমাংসা হয়। আত্ম সমুন্নতির ঐকান্তিক অভিলাষই যে উহার মুখ্য উপায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মই যে উক্ত রূপ অভিলাষের অন্তরঙ্গ সাধন, তাহাতেও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যিনি আত্মাকে সমুন্নত করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাবতীয় সাধু ভাবের নিয়ামক। ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া কোন সাধু সংকল্পই এক পদ মাত্র অগ্রসর হইতে পারে না। যেমন শরীরের উত্তমাঙ্গ না থাকিলে অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত সম্পূর্ণ সৌষ্ঠব ও লাবণ্য সমন্বিত হইলেও কোন কার্য্যকর হয় না, অথবা যেমন মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে অপরাপর প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের কোন কলবত্তা থাকেনা, সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থা না থাকিলে আত্মোৎকর্ষ বিধানের কোন উপায়ই সমীহিত সিদ্ধি লাভের উপযোগী হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানব-হৃদয়-

গত মনুষ্যত্ব সদ্ভাব-চক্রের নাভি স্বরূপ ; না-ভির অসদ্ভাবে কিপ্রকারে চক্রের গতি নি-ষ্পাদিত হইবে ?

ধর্ম্মের ভাব যে মনুষ্যের প্রকৃতি সিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে সামান্যাকারে স্বীকার করিয়া লইলেও এস্থলে বিশেষ রূপে তাহার নি-রূপণ করা অসঙ্গত হইবেনা।

মনুষ্যের বুদ্ধি দ্বারা এপর্য্যন্ত যে সমস্ত বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, তৎসমুদয় যদি প্রগাঢ় ও সংশয়-শূন্য বলিয়া প্রতীত হয়, তবে মানব-প্রকৃতির যে একটি ধর্ম্ম-তত্ত্ব আছে, ইহাতেও আর কোন সংশয় থাকে না। একমাত্র মনুষ্যের প্রকৃতি ভিন্ন তা-দৃশ ধর্ম্ম-তত্ত্বের আর কুত্রাপি সংস্রব নাই। তাহা ভুমণ্ডলের পশ্চিম খণ্ডের কি পূর্ব্ব-ভাগের, নবীন কি প্রাচীন জগতের অথবা এই সমগ্র জগতেরও বিশেষ ধর্ম্ম নহে। সমস্ত বিশ্বের সহিতই তাহার সম্বন্ধ আছে। রোম, জেরুসালম, মক্কা প্রভৃতি কোন পার্থিব রাজধানীর অধিকার নিমিত্ত তাদৃশ ধর্ম্ম-তত্ত্বের আবির্ভাব হয় নাই। বেদ, কোরাণ কি বাইবেল কোন প্রকার পুস্তক মধ্যেও তাহা আবদ্ধ নাই। সে ধর্ম্ম কোন শুভ্র বা কৃষ্ণ বর্ণ জাতিরও নিজস্ব নহে, তাহা ইউরোপ কি ভারতবর্ষ—গ্রীস্ কিম্বা পারস্য—পালেস্টিন্ অথবা মিসর রাজ্যের ধর্ম্ম নহে। মূসা যখন মিসরের, লূথর ইউ-রোপের এবং রামমোহন রায় ভারত বর্ষের ধর্ম্ম-প্রণালী সংশোধিত করিয়াছিলেন, তা-হার পূর্ব্বেও ঐ উল্লিখিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। তাহা তীর্থাদি কোন স্থান মাহাত্ম্যেরও অধীন হইতে পারে না এবং মনুষ্যের অ-বস্থা ভেদেও তাহার আবির্ভাব বা তিরো-ভাব হয় না। মনুষ্য সভ্যতার পরাকা-ষ্ঠাতেই অধিরোহণ করুক, অথবা আদিম অসভ্যাবস্থাতেই আবদ্ধ থাকুক, তাহার প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম্ম-তত্ত্ব আর কস্মিন কালেও অন্যথা হইবার নহে, তাহা চিরকালই সমভাবে বিরাজ করিতে থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতির বিধ্বংস না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্মেরও বিলোপ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, উহা নিয়তই তাহার সঙ্গী হইয়া চলিবে। যেখানে মনুষ্য থা-কিবে, সেই খানেই তাহার ধর্ম্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহার বুদ্ধি ও বিবেক, চিন্তা ও অনুভব, মন ও অন্তঃকরণ যেমন স্বভাব-সিদ্ধ, তাহার ধর্ম্মও অবিকল সেই রূপ। আদিকালের অতি পুরাতন পুরাবৃত্ত মধ্যেও উহার প্রতিভার যে রূপ নিদর্শন পাওয়া যায়, অনাগত অনন্তকালের অভ্যন্তরেও তাহা তদ্রূপই দেদীপ্যমান থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মানব-প্রকৃতির যে রচনা-পরিপাটী তাহাই ধর্ম্ম-তত্ত্বের মূল পত্তন ও অদ্বি-তীয় প্রমাণ। নীতি-শাস্ত্র-প্রয়োজক প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম-তত্ত্ব ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও উহাকে ঐরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিকও আমাদিগের অ-ন্তঃকরণে ধর্ম্ম-নীতি-সংক্রান্ত যে সমস্ত ভা-বের আবির্ভাব হয়, আমাদের প্রকৃতির কৌশলই সে সকলের মূল ও বিলক্ষণ প্র-মাণ। উল্লিখিত ভাব-সমস্ত অন্তর হইতেই উদিত হয়, বাহ্য হইতে নহে; তৎ সমুদায় আমাদের অন্তরেই অবস্থিতি করে এবং আমাদিগেরই সঙ্গে সংস্রব রাখে, বাহিরে বাহিরে কি কৃত্রিম ভাবে কখন সংযোজিত হয় না। ভুমির স্বভাবোৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় আপনা হইতেই সে সকল আমাদি-গের হৃদয়-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। ফলতঃ মনুষ্যের প্রকৃতিই এই, যাহা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রমাণ করিয়া থাকে, যাহাকে অনুমানের পরিবর্ত্তে আমরা অবিলম্বিত

প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের নিমিত্তই অবলম্বন করি, এবং যাহাতে এরূপ সত্য সকলের অনুসন্ধান করি, যাহাদের প্রমাণ করিবার আর অপেক্ষা থাকে না।

বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম-সুধাকর এই রূপে স্বয়ং সমুদিত হইয়া মানব-প্রকৃতির উল্লাসন বিষয়ে সম্যক রূপে উপযোগিতা করেন। তাঁহার সুবিমল কিরণ-রাজি অনভিজ্ঞ লোকদিগের দুর্ব্বোধ-কলুষিত মানস-গগনে উন্মেষ-শূন্য হইয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সুবোধ-সম্পন্ন বিজ্ঞগণ-হৃদয়ে সম্পূর্ণ রূপেই প্রতিভাত হয়। ধর্ম্ম উদার-প্রকৃতি মহীয়ান মানসে মহীয়ান এবং প্রীতি-প্রবণ সুকুমার মানসে প্রীতিময় ও নিরতিশয় সুকুমার হইয়া থাকেন। দেশভেদে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-প্রণালী নির্দ্ধারিত আছে, সবিশেষ চিন্তা ও অনুভব দ্বারা তৎ সমুদায় অতিক্রান্ত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উল্লিখিত প্রাকৃতিক ধর্ম্মকে সহস্র সহস্র চিন্তা ও অনুভবেও কখন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য-নিরূপিত কোন প্রকার ধর্ম্মের সেই পর্য্যন্তই অনুসরণ করা যায়, যে পর্য্যন্ত তাহাতে এরূপ কোন সিদ্ধান্ত দৃষ্ট না হয়, যদ্দ্বারা যথার্থ ধর্ম্ম-নীতি বিক্ষোভিতা ও হটস্থা হইতে পারে, অথবা ধর্ম্ম নীতি দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া যাহা ঘোরতর বিবাদের আস্পদ হইয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃতি-মুলক ধর্ম্ম-তত্ত্ব আমাদিগের অন্তঃকরণে এরূপ প্রগাঢ় ও বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, কোন প্রকার বিবাদ-সুত্রে আকৃষ্ট হইয়া কোন কালেও আর অপনীত হইবার নহে। ফলতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি বিবাদ বিসম্বাদের সহিত উহার সংস্রব মাত্রই নাই, বরং বিবেচনা করিয়া দেখিলে সর্ব্ব প্রকার বিরোধ ভঞ্জন করাই উহার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতিতে, পরমেশ্বরে ও মনুষ্যত্বে, মনুষ্য মাত্রই পরস্পর একীভূত এই রূপ অনুভব করাই উহার একটি প্রধান ফল।

অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় এধর্ম্মেরও আবির্ভাব আছে। যদি ধর্ম্মের স্বয়ং আবির্ভাব হওয়া সঙ্গত হয়, তবে এই ধর্ম্মের আবির্ভাবকেই যথার্থ আবির্ভাব বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি-সিদ্ধ যে সমস্ত মহত্তর পদার্থ-পুঞ্জ ইতস্ততঃ বিস্তৃত রহিয়াছে, মানব প্রকৃতির নিদেশানুসারে তৎ সমুদায় অনুধাবন করিয়া দেখিলে মানব-প্রকৃতি-মাত্র-সম্বদ্ধ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অভিপ্রায় সকল যে স্বতঃপ্রদীপ্ত ও স্বতঃপ্রমিত তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। পুরাবৃত্ত সম্বন্ধীয় কোন সত্য মূলক বৃত্তান্তের ন্যায় বাহ্য বস্তু হইতে সে সকলের প্রমাণ সঙ্কলন করা আবশ্যক হয় না। ইতিহাস-নিবদ্ধ কোন বিষয়ক বিবরণের সত্যতা নির্ণয় করিতে হইলে অগ্রে সাক্ষ্য সংকলন দ্বারা তাহার প্রমাণের বলাবল পরীক্ষা এবং সমান হস্তে তাহার সম্ভব্যাসম্ভবত্যের পরিমাণ করিতে হয়; পশ্চাৎ অসম্বদ্ধ বস্তু রাশি মধ্যে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যদি যৎসামান্য কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহারও সূক্ষ্মতা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত মহীয়ান ভাব সকলের নিশ্চয়তা নিমিত্ত সে রূপ কিছুই করিতে হয় না, শুদ্ধ সত্তা ও স্বভাবই তাহাদের যথেষ্ট প্রমাণ। ভুবনোদ্ভাসী ভাস্কর নিকরের ন্যায় তাহারা স্বয়ং সমুদিত হইয়া সমুজ্জ্বল কিরণাবলী বিস্তার দ্বারা মোহ রূপ অবিরল তিমির-জালের শান্তি বিধান করে। তাহারা বিশ্বের সর্ব্বভাগেই অলৌকিক আলোক-মালা প্রসারণ করতঃ প্রতিফলিত প্রতিভা দ্বারা উহাকে উদ্ভাসিত

করিয়া থাকে। মানব-প্রকৃতির অবস্থান নিমিত্ত তাহারা একটি স্বতন্ত্র জগতের উৎপত্তি করিয়া দেয়। পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগতের ন্যায় বাহ্য নয়ন দ্বারা সে জগতের আকার নিরীক্ষিত হয় না, তাহা আন্তরিক জ্ঞান-নেত্রেই প্রত্যক্ষ হইবার বিষয়। বাহ্য জ্ঞান-প্রভাবে প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটেই এই বাহ্য জগতের যেমন নূতন নূতন স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, সেই রূপ ঐ অনির্দ্দেশ্য পারলৌকিক জগৎও অন্তঃপ্রবুদ্ধ জ্ঞান-সন্নিধানে নব নব ভাবে প্রকাশ পায়। ফলতঃ উল্লিখিত নীতি ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত ভাব সমস্ত আমাদিগের অন্তরেই বিরাজমান হইয়া আনন্দময় আধিপত্য প্রচার করিতে থাকে এবং পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে ঐ সকলই যথার্থ আবির্ভাবনের উপযুক্ত হইতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি স্বর্গ হইতে ধর্ম্মের আবির্ভাব সংকলনে ব্যবসিত হন, অর্থাৎ এরূপ অপরিদর্শনীয় অত্যাবশ্যক গুরুতর সত্যের আবিষ্কার ও প্রচারার্থে সংকল্প করেন, যাহা অন্য কোন প্রকারেই আর পরিজ্ঞেয় হইবার বিষয় হইতে পারে না, তখন তিনি অপরিচিত-অক্ষর-মালা-নিবদ্ধ এক খানি অপূর্ব্ব ভাষায় গ্রন্থ আনিয়া উপস্থিত করেন। তাহার অর্থগ্রহ করিতে হইলে ভাষান্তরে অনুবাদ ও বিশিষ্ট রূপ ব্যাখ্যান ব্যতীত আমাদিগের আর অন্য উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু সেই সকল প্রক্রিয়াতে যে নানা প্রকার ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা বিলক্ষণ অনুভব সিদ্ধ। সুতরাং ধর্ম্ম প্রকাশের এরূপ চেষ্টা করা কেবল মানব-প্রকৃতির প্রতি এক প্রকার পরিহাস অথবা তদপেক্ষাও কোন অধম ব্যাপারের বিষয় হইয়া উঠে। কেহ কেহ বলেন, পরমেশ্বর মুসাকে প্রাচীন ইহুদী ভাষায় যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই ধর্ম্মের যথার্থ আবির্ভাব। তন্মধ্যে এই একটি উপদেশ আছে, আমি যে তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমি একটি ঈর্ষান্বিত পরমেশ্বর, পুত্রদিগের প্রতি জনকগণের যে অসমদর্শিতা ও অবিচার, সে সকল আমি পর্য্যবেক্ষণ করি। এস্থলে পদে পদে সংশয় উপস্থিত না হয় এমন একটি পদও কি বিদ্যমান আছে? ইহার প্রত্যেক শব্দেরই অর্থ কি কি? সমুদয় প্রস্তাবেই বা কোন্ অর্থ উদ্ভাবিত করে? লেখকের অভিপ্রায়ে ঈর্ষা ও পরমেশ্বরই বা কি পদার্থ এবং আমাদিগের মনেই বা সে সকলের কি রূপ ভাব প্রকাশ পায়? আমরা কি উল্লিখিত শব্দ সকলের যথার্থ অভিপ্রায় ও তাৎপর্য্যার্থ অবধারণ করিতে পারিয়াছি? সে সকল কি কোন জাতি বিশেষ মাত্রে সংকীর্ণ ভাবে অথবা বিশ্বজনীন রূপে প্রয়োগার্হ হইবে বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে? তাহাদের শক্তি ও সত্যত্ব কি ক্ষণকালবর্ত্তী অথবা অনন্তকালস্থায়ী? এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ঘোরতর সংশয়-তিমিরে আচ্ছন্ন হইতে হয়। কিন্তু যে সমস্ত চিন্তা-রত্ন আপনা হইতেই আমাদিগের হৃদয়াকরে উৎপন্ন হয়, উক্ত রূপ সন্দেহ-মল দ্বারা সে সকলের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিলুপ্ত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ যে সকল বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মের পবিত্র মূর্ত্তি বিরাজ করিতে থাকেন, কতগুলি শব্দ, কেবল শব্দ মাত্রই তৎ সমুদায়ের কখন প্রকাশক হইতে পারে না। অনন্ত স্বরূপ পরমেশ্বর-বিষয়ে অথবা মানবীয় একটি অবিনাশী স্বরূপের সত্তা পক্ষে আমাদিগের যে সমস্ত বিশুদ্ধতম অভ্যুন্নত মহীয়ান উদার ভাবের উদয় হয়, কেবল শব্দমাত্র সহকারে আমরা কোন ক্রমেই সে সকল সংকলন করিতে পারি না। এরূপ ভাব আমাদিগের অন্তরাত্মা হই-

তেই স্বতঃ প্রবুদ্ধ হয় এবং আমরাই তাহার অধিকারী। তাহা বিশ্ব-প্রসবিনী প্রকৃতি দেবীর একটি অঙ্গ স্বরূপেই প্রকাশমান হয়। প্রকৃতি-সিদ্ধ পদার্থ সকল যেমন আপনা হইতেই উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেই রূপ ঈশ্বরের সত্ত্বা ও আত্মার অবিনাশিত্ব বিষয়ে আমাদের চিত্তবৃত্তিও স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বৃদ্ধি পায়। যাহারা নিতান্ত অসভ্য, হিতাহিতের প্রভেদ করিতে পারেনা, পশুদিগের ন্যায় কেবল স্বাভাবিক সংস্কারের বশম্বদ হইয়া চলে, তাহাদিগেরও অন্তঃক্ষেত্রে কখন কখন উক্ত রূপ পরিশুদ্ধ চিন্তা-প্রবাহ সকল প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহারাও অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভাব সকলের রসাস্বাদ করিতে পারে। যে অনির্ব্বচনীয় ঐশী শক্তি প্রভাবে বিশ্বের সমস্ত কার্য্যজাত নিষ্পন্ন হইতেছে, উল্লিখিত ধর্ম্মভাবও তাহারই অন্তর্গত। যেমন ভূমি হইতে শস্যাদির উৎপত্তি হইতেছে, গগন মণ্ডলে নক্ষত্রমালা বিরাজ করিতেছে, প্রবলতর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে সূর্য্য গ্রহনিবহ তারকপুঞ্জ ও জগৎ সমূহ পরস্পর সম্বদ্ধ ও সমঞ্জসীভূত হইয়া রহিয়াছে, সেই রূপ মহাপ্রতাপ ধর্ম্মরাজ আপনা হইতেই মনুষ্যের হৃদয়-সিংহাসনে চিরকাল বিরাজ করিতেছেন। যেকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতি দেবীর সত্ত্বা থাকিবে সে পর্য্যন্ত তাঁহারও বিপ্রণাশ হইবার প্রশক্তিমাত্র থাকিবেনা।

অতএব মানব প্রকৃতির যে একটি ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইল। মানব প্রকৃতি বাক্য মনের অগোচর এক অনাদি পরমেশ্বরের আরাধনা করে এবং উত্তর কালে স্থিরতর নিত্য সুখ লাভের প্রত্যাশা রাখে, কল্পনা সম্ভূত আরোপিত যে পূর্ণতা ও সমুন্নতি তাহাই ইহার যাবতীয় উপদেশের মূলীভূত ও সার মর্ম্ম। সেই মর্ম্মের অনুসারেই আমরা পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রভুত্ব ও সততা, অখণ্ডনীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলা, করুণা পূর্ণ সংকল্প ও অব্যর্থ নিষ্পাদনের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করি এবং আশা ও ভয়ের সহিত তাঁহার প্রতি প্রীতি করিয়া অপার আনন্দ স্রোতে ভাসমান হই। মহীয়সী ধর্ম্মনীতির সাহায্যে আমরা যে, শোভা ও সামর্থ্যের সত্ত্বাসত্ত্ব বিবেচনা করিয়া ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ করি, সামাজিক প্রবৃত্তির বশম্বদ হইয়া প্রকৃতি-সম্ভূত যাবতীয় পদার্থজাত এক পিতা হইতে উৎপন্ন এই রূপ জ্ঞান করত ধর্ম্মতীর্থের যাত্রী মাত্রকেই আনন্দিত ও উৎসাহিত করি; পরম পিতার অভিপ্রেত ও প্রিয় কার্য্য বোধে কৃচ্ছ্র সাধ্য উৎকট ধর্ম্ম সকলেরও যথাবৎ অনুশীলন করি এবং এই রূপে মনুষ্যজীবনের মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনে সমর্থ হই, ইহাই যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব। আহা! ইহাতে কি সারল্য কি নির্ম্মল বিশুদ্ধ ভাবই বিরাজ করিতেছে! ধর্ম্মের কার্য্য ও ফল বলিয়া যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহা ইহা দ্বারাই সম্যক রূপে সম্পাদিত হয়, কোন কাল্পনিক ধর্ম্ম-পদ্ধতি দ্বারা কদাচ সেরূপ সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

উল্লিখিত ধর্ম্ম তত্ত্বই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপজীব্য। ইহা আমাদিগের হৃদয়-ধামে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবির্ভাব, ধর্ম্ম-নীতির বলাধান এবং সুবিমল সন্তোষ প্রদানের আশ্বাস করিতে থাকে। অতএব হে ভ্রাতৃবর্গ! আত্মার উৎকর্ষ সাধন যদি বিধেয় হয়,—অচিরস্থায়ী অসার বিষয়-রসে চির-নিমগ্ন না থাকিয়া চিরস্থায়ী সারবৎ পরমার্থ রসের আন্দোলন করিবার যদি বাসনা হয়, তবে প্রীতি-প্রবণ চিত্তে সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রিত হও।

———

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬১ পৃষ্ঠার পর।

যদিও ভারতবর্ষীয়দিগের রাজ্যাদি বিস্তার বিষয়ে তাদৃশ যত্ন ও উৎসাহ ছিল না কিন্তু তাঁহারা যে অধ্যাত্ম বিদ্যার যৎপরোনাস্তি শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, বোধ হয় তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি প্রবৃত্তি বিশেষে অল্প আসক্ত ছিল বলিয়াই অধ্যাত্ম বিদ্যার এই রূপ উন্নতি বিধানে সমর্থ হয়। মানব জাতির ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে উন্নতির মুখে উপনীত হইতে হইলে পূর্ব্বে তদনুরূপ প্রস্তুত হওয়া চাই। প্রকৃত সত্যের আলোক লাভ করিবার পূর্ব্বে ভ্রান্তি-সমুদায় তিরোহিত হওয়া আবশ্যক। এই পৃথিবীতে পূর্ব্বে কত প্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু বালকেরা দুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া সবলকায় হইলে পশ্চাৎ অন্নরস যেমন সেই দুগ্ধের স্থানকে অধিকার করে, সেই রূপ এক একটি জীবন্ত ধর্ম্ম প্রকৃত অবসরে ঐ সমস্ত ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া তাহাদিগের স্থানকে অধিকার করিয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে আর্য্য জাতির মধ্যে জড়ের উপাসনা প্রচলিত ছিল, তৎপরে ভারত বর্ষীয়েরা তৎকাল-প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া আর একটি ধর্ম্ম প্রস্তুত করেন। এই ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বাহ্য পদার্থের উপাসনার পরিবর্ত্তে কেবল আন্তরিক ধ্যান ধারণারই ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকে। এক সময়ে এই ধর্ম্মের এই রূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল যে স্মরণ হইলেও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অধিক কি এই ধর্ম্ম এখনও আর্য্যদিগের সীমাকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মণদিগের চিরন্তন বিশ্বাসের নিতান্ত পরিপন্থী ছিল। পূর্ব্বতন প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টিয়ানদিগের সহিত রোমন ক্যাথলিকদিগের যে রূপ সম্বন্ধ বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগেরও সেই রূপ। ভারতবর্ষই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান উভয়ের এই প্রকার বিপক্ষ ভাব তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। বুদ্ধ দেবের যেরূপ মত, তাহা নিতান্ত নূতন নহে। তাঁহার পূর্ব্বেও যে ঐ প্রকার মত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, অন্যান্য দেশে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে প্রকার হৃদয়গ্রাহী প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষে ঐসমস্ত মত প্রচারিত হইয়াছিল, যে প্রকারে ভারতবর্ষীয়দিগের মনোমধ্যে তৎসমুদায় স্থান লাভ করে, যে প্রকারে সর্ব্বাগ্রে অধস্তন শ্রেণীর লোকেরা আগ্রহের সহিত এই ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করিয়াছিল, যে প্রকারে নৃপতিরা ইহাকে রাজ্য মধ্যে বিস্তার করেন, তাহা অতিশয় বিস্ময়োৎপাদক। তৎসমুদায় ভারতবর্ষীয়দিগেরই পূর্ব্বতন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে এরূপ কতগুলি সত্য আছে, যাহা সকল প্রকার পদার্থ বিদ্যার অনুমোদিত এবং যে ধর্ম্ম ক্ষয়োন্মুখ পৌত্তলিকতা ও নিষ্ঠুর পৌরোহিত্যাধিকার হইতে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতেও ঐ রূপ সমস্ত সত্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবার এমনও কতগুলি সত্য আছে, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য ভ্রান্তিমূলক ধর্ম্মেও নিরীক্ষিত হয়। যাহাই হউক, যেস্থলে মনুষ্যেরা ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালী দূষিত দর্শন করিয়া বহুকালাবধি সত্যের আলোচনায় প্রস্তুত হয়, সেই ভারত বর্ষেই এই বৌদ্ধ-

ধর্ম্ম অবলম্বিত ও পোষিত হইয়াছিল। ভারত বর্ষেই বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত মত ইতিহাস মধ্যে সন্নিবিষ্ট এবং একটি ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়; ফলত যদি লোক সংখ্যার উপর ধর্ম্মের সত্যাসত্য নির্ভর করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষে তৎকাল-প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্ম যে একটি সত্য-ধর্ম্ম ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অতি পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান অধিকার করে নাই। যদিও এই ধর্ম্ম এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে অন্তরিত হইয়াছে, যদিও এক্ষণে ভারত বর্ষে প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাচ সিলোন, সায়াম, আবা, পেগু উপদ্বীপ এবং ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, তাতার, মঙ্গলিয়া ও সাইবিরিয়া দেশে ইহার সম্যক প্রচুর্ভাব দেখা যায় এবং এক্ষণে ইহা একটি দূষিত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেও বহুসংখ্য লোক ইহা সত্য ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অবধিই পৃথিবীর বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত ইতিহাসের সময় গণনা আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই সময়ই ভারতবর্ষের মধ্যাহ্ন কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের মনোবৃত্তির উন্নতি সবিশেষ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সময়কেই ভারতবর্ষের অবস্থা নির্ণয় করিবার অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। অধ্যাপক উইলসন আপনার অনুবাদিত বিষ্ণু পুরাণে, অধ্যাপক বর্ণুফ স্বপ্রণীত বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত ইতিহাসের অনুক্রমণিকায় এবং অধ্যাপক লাসেন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব কাল নিরূপণে এই কালকেই কাল গণনায় অনুকূল বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় বর্ণন করা এস্থলে আমাদিগের তাদৃশ উদ্দেশ্য নয়। যেমন খৃষ্টীয় শক পৃথিবীর ইতিহাসকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া দিতেছে, সেই রূপ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি কাল ভারতবর্ষের ইতিহাসকে দুই অংশে বিভক্ত করিতেছে, এক্ষণে তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আমাদিগের অভিপ্রেত। বেদের কাল নিরূপণ বিষয়ে এই প্রণালী যার পর নাই উপযোগী হইতেছে। এই অভিনব ধর্ম্মের আবির্ভাব ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য আধিপত্যের এত দূর পরিপন্থী হইয়াছিল যে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন আপনার জয় পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন আর্য্য ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের ধর্ম্ম উচ্ছেদ হইবার আশঙ্কায় রোষানলে প্রদীপ্ত হইয়া উহার প্রতি যে রূপ কটু দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া ছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থ সকল এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ফলত বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদই ঐ সমস্ত গ্রন্থের একটি ঐতিহাসিক সংস্রব সংস্থাপিত করিয়া দিতেছে। আমরা এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই বৈদিক কাল নিরূপণে প্রবৃত্ত হইব।

এক জন ব্রহ্মবাদিনীর উক্তি।

(কোন্নগর হইতে প্রাপ্ত)

হে পরম করুণাময় পরমেশ্বর! আমাদের এই যে ব্রাহ্মসমাজ বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, তজ্জন্য তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। আহা! যখন আমার মন ইহার উন্নতির অবস্থা স্মরণ করে, তখন যে কি অপার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা রসে মগ্ন হয়, তাহা বলিতে পারি না। জগদীশ! এসকল মঙ্গলের

কারণ কেবল তোমারই অপার করুণা! নতুবা আমাদের ক্ষুদ্র বলে কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্যের কি এমন সাধ্য আছে যে, সে কেবল নিজ বলে জগতের কোন মঙ্গল কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয়? কখনই না। হে পরম পিতঃ! তুমি যে আমাদিগকে তোমার উপাসনার অধিকারী করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর আমাদের কিছুই নাই। আহা! এই উপাসনা কি সমাজে কি পরিবারের মধ্যে কি নির্জ্জনে যে স্থানেই করি, সেই স্থানেই পরম শান্তি প্রাপ্ত হই। যখন আমরা পাপে তাপিত, শোকে আকুল কি অন্য কোন কারণে অস্থির-চিত্ত হই, তখন যদি কোন নির্জ্জন স্থানে গমন পূর্ব্বক একান্ত মনে নম্রভাবে তোমার উপাসনা করি, তাহা হইলে আমাদের সেই সকল দুঃখের আর লেশ মাত্রও থাকে না এবং মন একেবারে পবিত্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়। সেই রূপ কি বিপদে কি সম্পদে যদি আমরা প্রতিদিন সপরিবারে তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, তবে আমরা যে কতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারি, তাহা বলা যায় না। আহা! তাহা হইলে আমাদের নিকট বিবাদ কলহাদি কিছুই স্থান পাইতে পারে না, এবং সকলেই একমনা হইয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নশীল হই। আর সামাজিক উপাসনায় যে কতদূর পর্য্যন্ত হিত সাধন হয়, তাহা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন। কেন না এই সমাজই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এবং চরিত্র সংশোধনের এক মহৎ উপায়। আহা! এই উপাসনার দ্বারাই মনুষ্যের সকল দুঃখ নিবারণ ও অনন্ত সুখের উৎপত্তি হয়। যখন কোন রোগী ব্যক্তি তাহার রোগ-যন্ত্রণায় নিতান্ত অস্থির হয়, তখন যদ্যপি সে একান্ত মনে প্রীতির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করে, তবে আর তাহাকে সেই যন্ত্রণা কাতর করিতে পারে না। যখন কোন গৃহী ব্যক্তি স্বীয় পুত্রের মৃত্যু-জনিত একেবারে শোকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েন, তখনও যদি তিনি চিত্ত স্থির করত সেই পরমেশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি ঐহিক সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হওত পরম সুখ প্রাপ্ত হন। যে সময় কোন অবীরা নারী আপনাকে নিতান্ত দুরবস্থ ও অসহায় ভাবিয়া বিষাদ-সাগরে মগ্ন হন, সে সময়ও যদি তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সেই দুঃখ বিনাশের জন্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সকল দুঃখ সকল চিন্তা নিবারণ হইয়া অপার আনন্দের উৎপত্তি হয়। কারণ, ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল দুঃখ ও শোক প্রদান করেন, তাহা কেবল আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত। অতএব ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি জন্মিলে, আর কোন দুঃখ কাতর করিতে পারে না। হে পরম পিতঃ পরমাত্মন্! যাহাতে আমরা সকলে অলীক সাংসারিক সুখে নিস্পৃহ হইয়া, প্রীতি ও ভক্তির সহিত তোমার উপাসনা করিতে পারি ও তোমার আজ্ঞা সকল সাধ্যমতে প্রতিপালন করিতে ত্রুটি না করি, এই রূপ ক্ষমতা প্রদান কর। জগদীশ! তোমা বিনা এমন কৃপাবান পিতা ও এমন হিতৈষী বন্ধু কোথায় পাইব? আহা! এখানকার কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়, সকলের সহিতই বিচ্ছেদ হইবে। নাথ! তোমার সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই কেবল চিরকালের নিমিত্ত। নাথ! তোমার বল প্রেরণ করিয়া এক্ষণে আমাদের দুর্ব্বল মনকে সবল কর। তুমিই আমারদের পরম গতি, তুমিই আমারদের পরম আশ্রয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

(FROM THE NATIONAL PAPER.)

As in his last, so in his present letter, Mr. Anglicanus has put forth a few propositions of his creed unsupported by any valid arguments at all. Without meaning any offence to the learned writer on "Christianity" we here beg to suggest in a friendly spirit that if his theological lucuberations are intended for the good of those opposed to his creed, which we presume to be the case, in as much as those orthodox in their religious belief have had enough of such teaching both in a learned and popular shape to need any more, his treatment of the subject, ought, we think, to be a little more comprehensive and convincing. Surely, he cannot expect us to believe that once in the

flight of ages past the Infinite and Immutable God assumed the form of a lowly man, partook of the pleasures and anxieties inherent in the mortal flesh, then being crucified and dead he descended into hell; rose again the third day from the dead; ascended into heaven, and sat on the right hand of God from whence he shall come to Judge the quick and the dead; that the Godhead instead of being one only indivisible Being, consists of three persons each infinite and of equal rank, having separate consciousnesses, and volitions. Surely, we say, he cannot expect us to belive these things simply because they chance to be included in the Athanasian creed. But it may be said the creed is based on the Bible, the word of God, that it contains nothing which cannot be deduced from the Christian Scriptures. Well then, waiving for the present the question as to whether or not we are justified in accepting as truth, every thing that may be contained within the lids of the Bible, does the Bible itself, we ask, *explicitly* teach us the doctrines of the Trinity and the Divinity of Christ,—doctrines which Mr. Anglicanus would have us believe and which for some centuries together the Christian Church has been peremptorily bidding the world either to accept or be damped for ever? There is not, we believe, one single passage in the whole compass of the Bible in which it is distinctly said that the being of God is threefold. On the contrary we constantly meet in the New Testament with passages, which distinctly declare the Unity of God. We cannot of course admit of inferences and deductions in so important a matter, for if those were allowed we do not know of anything into which the sense of some one or other of the numerous scriptural texts might not be tortured. Has not Polygamy been upheld in the name of the Bible? Have not passages been quoted from the scriptures to support the abominable system of slavery. If the object of any special Revelation, such as the Bible is declared to be, is to enlighten us on those points of which we cannot have any distinct knowledge from the ordinary works of nature, and if the doctrine of Trinity is one of these points, it is to be expected *prima facie* that it should have been set forth in such a manner as the commonest understanding may have had access to it. But so far is this from being the case that the word Trinity or some other word of the same import is not at all to be met with from the beginning to the end of the Bible. Again, Christian writers inform us of their religion having progressed in the midst of enemies who lost no opportunity in attacking what they deemed its vulnerable points. Now the Jews, veteran enemies to Christianity, pluming themselves as they used to do on their recognition of the Unity of God, could not have got a better handle with which to assail the Christians than the Trinity. But we have received no account of the Jews, intolerant as they were, of raising any the least objection on the score of this peculiar dogma of Christianity. The apostolic writings treat of other controversial subjects and other objections against Christianity; but are perfectly silent as to their most important subject, thereby clearly shewing that the first preachers of Christ's religion had no knowledge most probably of the doctrine of Trinity, that it was of latter invention, and reached its prefection at the hand of the schoolmen.

But we would nevertheless deny that there are certain passages in the Bible which confirm the popular notion of the Divinity of Christ such as " I and the Father are one," " the Father in me and I in Him." But on the other hand a larger number of passages run counter to the spirit of these texts such as " my Father is greater than I," " I am in my father, and ye in me, and I in you," " that they Holy Father, may be one, even as we" &c. So in this way it will be seen that by far the larger portion of the New Testament is filled with passages that unmistakeably tend to shew the inferiority nay creatureship of the " son" in relation to the " Father." If contradictions should be avoided, (for who can deny that the passages " I and the Father are one" and " my Father is greater than I" do contradict each other?) we must adopt one of the two alternatives, either admit of a greater latitude of interpretation; or hold Christ to be inconsistent and designing. We for one are not disposed to take such an uncharitable view of Christ's character as the latter hypothesis would imply. We would only rest satisfied with the observation that the Bible is anything but explicit in its ennunciation of the doctrines which constitute the life-blood as if it were of Popular Christianity.

But supposing for argument's sake that the Bible were as explicit as we could wish it to be in expounding the above doctrine, would we then be justified in accepting them as truths and nothing but truths? Repudiators of book revelation as we are, it cannot be expected of us we should accept any thing as true simply because of its having been mentioned as such in the Bible. In a former issue of this paper we attemped to shew that we are not justified in holding anything as the revealed word of God which does not coalesce with the dictates of our intuitional consciousness. Let us try the above doctrines by the application of this test and see how they stand the trial. Now the three persons constituting the Trinity are declared to have seperate consciousnesses and separate wills, to hold converse with each other and to be fond of each others' company, and yet are they said to be one and the same Being. Having all the characteristics of three different personalities we are yet to regard them as one indivisible unity!! Again the Divinity of Christ presupposes that we consider him possessing at the same time the properties of both human and divine natures; to be both finite and infinite at once; to be in short God-man. Now, no one we hope, will deny that these notions commonly entertained about the Trinity and the Divinity of Christ involve the most palpable contradictions. "Perplexities from the nature of Number, of time, of Being; in short all those various conceptions of the mind which are its ultimate facts, and beyond which no power of analysis can reach us;" these says Bishop Hampden while speaking on the Trinitarian controversies "I think," in his Bampton Lectures*** "are our stumbling blocks, causing the wisdom of God to be received as the foolishness of men. These have forced themselves on the form of Divine mystery, and given it that theoretic air, that atmosphere of repulsion, in which it is invested." The ground on which we reject these two fundamental doctrines of Christianity is not because of their mere difficulty, their mysteriousness, that our understanding is not capable of grasping them. We believe in many things which are not cognizable by the logical faculty. We, for instance, believe in the existence of an external world though we have no knowledge of as to how it comes in contact with our mind. We believe in the existence of an *unknown* underlying *substance* in which all the phenomena we perceive inhere. In short "the sphere of our belief is much more extensive than the sphere of our knowledge." We therefore repudiate the Trinity and the Divinity of Christ not because they are difficult of comprehension but because they are contradictory and clash with our intuitive preceptions of Number, Time and Being.

As this is a very important subject relating to the nature and attributes of the Supreme Being, to which it is impossible to do justice in the compass of a single newspaper article, we may resume our considerations bearing upon this matter in future numbers of our Paper.

দুর্ভিক্ষ উপশমের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্ত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত		৫৩৪॥৶৹
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৫।৶৹
গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-জব্বলপুর		২৫
মাখন সিং দারগা ..	ঐ	২৫
জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১০
যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় ..	ঐ	৪
ভৈরবচন্দ্র বসু	ঐ	৫
মাষ্টর বিঃ উইলিএমস্ পঞ্জাব		৮
ডেপুটি কমিসনর আপীষ	ঐ	৬।০
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	৭
বৈদ্যনাথ দে	ঐ	৫
ভগবানচন্দ্র মল্লিক ..	ঐ	৩
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১
নিমাইচন্দ্র দত্ত	ঐ	২
মূলচাঁদ	ঐ	৫
লালা গঙ্গারাম	ঐ	৫
গোলাম মহম্মদ খাঁ	ঐ	৫
হাজিগোলাম মহম্মদ খাঁ ..	ঐ	৫
করমহাইভর	ঐ	৫
চণ্ডুলাল	ঐ	৪৸০
লালাঘক্কারাম	ঐ	১
চকমন	ঐ	১
উত্তম চাঁদ	ঐ	১
সেখ মিহির বক্স	ঐ	১
পুলিষ আমলা হইতে প্রাপ্ত	ঐ	৮
নির্ম্মল দাস	ঐ	১
		১৫৯।৶০
		৬৯৪

দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত দশে প্রেরিত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৪৫০
সম্প্রতি প্রেরিত	১০০
	৫৫০
স্থিত	১৪৪

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪২৯
পুস্তকালয়	১৪০৸৶১০
যন্ত্রালয়	১৬৫৷৴০
ডাক মাসুল	৪১৸৵০
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	১৫৯৷৶০
দান প্রাপ্ত	৶০
গচ্ছিত	৯৩ ৶০
	১০৩০(১০

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১১১৷৴১৫
পুস্তকালয়	১০২৵০
যন্ত্রালয়	১৬২৷৴১০
মাসিক বেতন	২২৬৷৵৫
ডাক মাসুল	৫৯৷৴০
অনিরূপিত	২২৷৫
আলোকের ব্যয়	২১৷৵১০
দুর্ভিক্ষ উপসমার্থ মেদিনীপুরে প্রেরিত	১০০
গৃহ সংস্কার	১১৷৶৫
গচ্ছিত	১৫৪৷৫
	৯৭২(১৫

আয়	১০৩০(১০
পূর্ব্বকার স্থিত	২২১(৫
	১২৫১(১৫
ব্যয়	৯৭২(১৫
স্থিত	২৭৯

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী	২৫
" শ্যামলাল পাল	২
	২৭

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ..	৪

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে	৫
" কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়..	১
	৬

অনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২
" দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ..	১
	৩
	৪০

আয়	৪০
পূর্ব্বকার স্থিত .	১১৫৸০
	১৫৫৸০

ব্যয়

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে দান	২০
শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের সাম্বৎসরিক দান আদায় জন্য সকারের কমিসন	১৶০
	২১৶০
স্থিত	১৩৪৷৶০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

অশুদ্ধ শোধন।

গত মাসের পত্রিকায় "মহাত্মা হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক প্রাপ্তি" প্রস্তাবে অনবধানতা বশত শ্রাবণ মাসের চতুর্থ রাত্রিতে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি ভাদ্র মাসের চতুর্থ রাত্রিতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ২৫ কার্ত্তিক শনি বার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
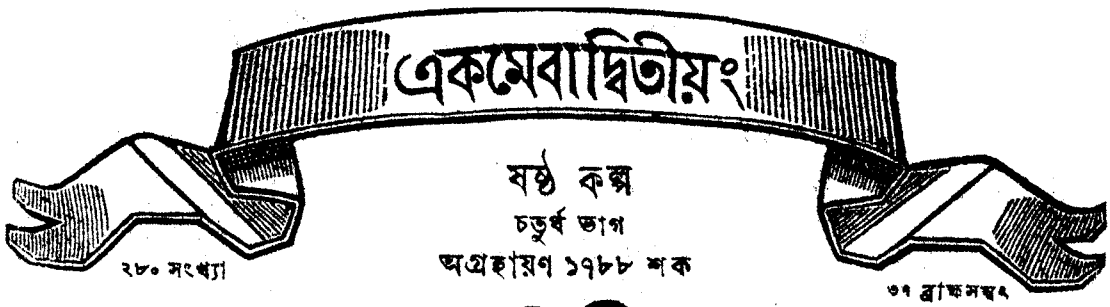
ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে একাদশং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৯৫

১১। তা অস্য পৃশনায়ুবঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ। প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রং হিন্বন্তি সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যং।

১১। 'তাঃ' পূর্ব্বোক্তাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'পৃশনায়ুবঃ' স্পর্শনকামাঃ 'পৃশ্নয়ঃ' নানাবর্ণাঃ গাবঃ ইন্দ্রেণ পাতব্যং 'সোমং' পয়সা 'শ্রীণন্তি' মিশ্রীকুর্ব্বন্তি। 'ইন্দ্রস্য' 'প্রিয়াঃ' প্রীতিহেতুভূতাঃ তাঃ 'ধেনবঃ' 'সায়কং' শত্রূণাং অন্তকারকং 'বজ্রং' আয়ুধং 'হিন্বন্তি' শত্রুষু প্রেরয়ন্তি। ইন্দ্রো যথা শত্রুষু বজ্রং প্রেরয়তি তথা ইন্দ্রস্য মদং উৎপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

১১। সেই সমস্ত ইন্দ্রের করস্পর্শ লাভার্থী নানা বর্ণ ধেনু ইন্দ্রের পেয় সোম রসে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেয় এবং যাহাতে ইন্দ্র শত্রু-সংহারক বজ্র শত্রুগণের প্রতি নিক্ষেপ করেন, উহারা ইন্দ্রের এই রূপ হর্ষোৎপাদন করিয়া দেয়। ইন্দ্র উহাদিগকে যথোচিত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঐ সকল ধেনুই দুগ্ধ প্রদান পূর্ব্বক লোকের আশ্রয়ে থাকিয়া ইন্দ্রের রাজ্য লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করে।

৮৯৬

১২। তা অস্য নমসা সহঃ সপর্য্যন্তি প্রচেতসঃ। ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্ব্বচিত্তয়ে বস্বীরনু স্বরাজ্যং।

১২। 'প্রচেতসঃ' প্রকৃষ্টজ্ঞানাঃ 'তাঃ' গাবঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'সহঃ' বলং 'নমসা' স্বকীয়েন পয়োরূপেণ অন্নেন 'সপর্য্যন্তি' পরিচরন্তি। 'পুরূণি' বহূনি 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'ব্রতানি' শত্রুবধাদিরূপাণি বীর্য্যকর্ম্মাণি 'সশ্চিরে' সেবিরে জ্ঞাপয়ন্ত ইত্যর্থঃ। কিমর্থং 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' যুযুৎসূনাং শত্রূণাং পূর্ব্বমেব প্রজ্ঞাপনায়। অনেন যুধ্যমানা বৃত্রাদয়ঃ সর্ব্বে মরণং প্রাপ্তাঃ কিমর্থং ভবদ্ভিঃ প্রাণাংস্ত্যজন্ত ইতি তেষাং বোধনায়েত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

১২। ঐ সমস্ত প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-সম্পন্ন ধেনু স্বীয় দুগ্ধ দ্বারা ইন্দ্রের বলবীর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয় এবং যুদ্ধার্থী শত্রুগণের পরিজ্ঞানার্থ ইন্দ্রের শত্রু বধাদি রূপ বহুবিধ কার্য্য প্রচার করিয়া থাকে। উহারাই দুগ্ধ প্রদান পূর্ব্বক লোকের আশ্রয়ে

থাকিয়া ইন্দ্রের রাজ্য লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করে।

৮৯৭

গায়ত্রং ছন্দঃ

১৩। ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব।

১৩। অত্র শাট্যায়নিন ইতিহাস মাচক্ষতে। আথর্ব্বণস্য দধীচো জীবতো দর্শনেনাসুরাঃ পরাবভূবুঃ। অথ তস্মিন স্বর্গতে অসুরৈঃ পূর্ণা পৃথিব্যভবৎ। অথেন্দ্র স্তৈরসুরৈঃ সহ যোদ্ধু মশক্নু বন্ তমৃষিমন্বিচ্ছন্ স্বর্গং গত ইতি শুশ্রাব। অথ পপ্রচ্ছ তত্রত্যান্ নেহ কিমস্য কিঞ্চিৎ পরিশিষ্টমঙ্গমস্তীতি। তস্মা অবোচন্ অস্ত্যেতদাশ্বং শীর্ষং যেন শিরসা অশ্বিভ্যাং মধু বিদ্যাং প্রাব্রবীৎ। তত্তু ন বিদ্ম যত্রাভবৎ ইতি। পুন রিন্দ্রোঽব্রবীৎ তদন্বিচ্ছতেতি। তত্তাৈষিষুঃ। তচ্ছর্যণাবত্যনু বিদ্যা জহ্রুঃ। শর্য্যণাবদ্ধবৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ স্যন্দতে। তস্য শিরসোঽস্থিভিরিন্দ্রোঽসুরান জঘান ইতি। 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পরৈরপ্রতিশব্দিতঃ প্রতিকূল শব্দ রহিতঃ 'ইন্দ্রঃ' আথর্ব্বণস্য 'দধীচঃ' এতৎ সজ্ঞকস্য ঋষেঃ 'অস্থভিঃ' অশ্বশিরঃ সম্বন্ধিভিঃ অস্থিভিঃ 'নবতীর্নব' নবসংখ্যাকা নবতীঃ দশোত্তরাষ্টশতসংখ্যাকাঃ। তথা হি লোকত্রয়বর্ত্তিনো দেবাঞ্জেতুমাদাবাসুরী মায়া ত্রিধা সংপদ্যতে। ত্রিবিধাতীতানাগতবর্ত্তমান কালভেদেন তৎকালবর্ত্তিনো দেবাঞ্জেতুং পুনরপি প্রত্যেকং ত্রিগুণিতা ভবতি। এবং নব সম্পদ্যতে। পুনরপি উৎসাহাদি শক্তিত্রয় রূপেণ ত্রৈগুণ্যে সতি সপ্তবিংশতিঃ সংপদ্যতে। পুনঃ সাত্ত্বিকাদি গুণত্রয় ভেদেন ত্রৈগুণ্যে সতি একোত্তরাশীতিঃ সংপদ্যতে। এবং চতুর্ভি র্দ্বিকৈর্গু ণিতায়া মায়ায়া দশসু দিক্ষু প্রত্যেক মবস্থানে সতি নব নবতয়ঃ সংপদ্যতে। এবম্বিধ মায়ারূপাণি 'বৃত্রাণি' আবরকাণ্যসুরজাতানি 'জঘান' হতবান।

১৩। যাঁহার বিরুদ্ধে কেহই বাক্য স্ফুর্ত্তি করিতে পারে না, সেই ইন্দ্র মহর্ষি দধীচির অস্থি দ্বারা দশোত্তর অষ্টশত সংখ্য অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন।

৮৯৮

১৪। ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্ব্বতেষ্বপশ্রিতং। তদ্বিদচ্ছর্য্যণাবতি।

১৪। 'পর্ব্বতেষু' পর্ব্ববৎসু গিরিষু 'অপশ্রিতং' অপগত্য স্থিতং 'অশ্বস্য' অশ্বসম্বন্ধি দধীচঃ 'যৎ' 'শিরঃ' 'ইচ্ছন্' ইন্দ্রো বর্ত্ততে 'শর্য্যণাবতি' এতৎ সংজ্ঞকে সরসি 'তৎ' শিরঃ 'বিদৎ' অজ্ঞাসীৎ জ্ঞাত্বা চ তদাহৃত্য তদীয়ৈঃ অস্থিভি বৃত্রাণি জঘানেতি পূর্ব্বস্যা মৃচি সম্বন্ধঃ।

১৪। ইন্দ্র পর্ব্বতস্থ দধীচির অস্থি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ অস্থি শর্য্যণাবৎ নামক সরোবরে আছে ইহা জানিতে পারিয়া তাহা আহরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত অসুরগণকে সংহার করেন।

৮৯৯

১৫। অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে। ১। ৬। ৭।

১৫। 'অত্রাহ' অস্মিন্নেব 'গোঃ' গন্তুঃ 'চন্দ্রমসঃ' 'গৃহে' মণ্ডলে 'ত্বষ্টুঃ' দীপ্তস্য আদিত্যস্য সম্বন্ধি 'অপীচ্যং' রাত্রৌ অন্তর্হিতং স্বকীয়ং যৎ 'নাম' তেজঃ তৎ আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ 'ইত্থা' ইত্থং অনেন প্রকারেণ 'অমন্বত' অজানন্। উদকময়ে স্বচ্ছে চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলন্তি। তত্র প্রতিফলিতাঃ কিরণাঃ সূর্য্যে যাদৃশীং সংজ্ঞাং লভন্তে তাদৃশীং চন্দ্রেপি বর্ত্তমানা লভন্ত ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। যত্রান্তর্হিতং সৌরং তেজঃ তৎ চন্দ্রমণ্ডলং প্রবিশ্যাহনীব নৈশং তমো নিবার্য্য সর্ব্বং প্রকাশয়তি। ঈদৃগ্ভূত তেজসা যুক্তঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রঃ এব দ্বাদশাদিত্যেম্বিন্দ্রস্যাপি পরিগণিতত্বাৎ। অতোঽহোরাত্রয়োঃ প্রকাশক ইন্দ্রএব ইতি ইন্দ্রস্তুতেঃ প্রতীয়মানত্বাৎ ইন্দ্রো দেবতেত্যেতৎ উপপন্নং ভবতি। ঈদৃগ্ভূতস্য তেজসঃ আশ্রয়ত্বেন চন্দ্রমসঃ প্রাধান্য বিবক্ষয়া চান্দ্রমস্যামিষ্টৌ বিনিয়োগোঽপ্যুপপদ্যতে। ১। ৬। ৭।

১৫। এই রাত্রিকালে গমনশীল চন্দ্র মণ্ডলে যে তেজ অন্তর্হিত আছে, তাহাকেই দীপ্তিমান সূর্য্য-রশ্মি বলিয়া জানিবে। দ্বাদশাদিত্য মধ্যে পরিগণিত ইন্দ্রই সেই সূর্য্য। ১। ৬। ৭।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার।

একণে কেবল যে ধর্ম্ম-সংস্কারেই সকলে ব্যস্ত হইয়া আছেন, এমন নহে; সমাজ-সংস্কারের জন্যও ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছে। একণে ভারত বর্ষে সমুদায় বিব-

য়েরই পরিবর্ত্ত-লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এইক্ষণে যে প্রকার জ্ঞান শিক্ষা হইতেছে, ইহাতে অনেকেই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে আর আপনাদের উপযোগী বোধ করিতেছেন না। যদিও সমাজের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত অদ্যাপি রীতিমত প্রকাশ্য সম্প্রদায় নির্ম্মিত হয় নাই, তথাপি তদ্বিষয়ক উদ্যমের নিতান্ত অভাব নাই। যে ধর্ম্মের সহিত ইহ লোক ও পরলোকের সবিশেষ সম্বন্ধ, যে ধর্ম্ম বিষয়ক কুসংস্কার প্রায় তাবৎ উন্নতিকেই রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেই ধর্ম্ম-সংস্কারই সকল অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম-সংস্কারের সহিত সমাজ-সংস্কারের অতি নিকটতর সম্বন্ধ—বিশেষত এক্ষণে সমাজ-সংস্কার লইয়া ব্রাহ্মগণের মধ্যে সাতিশয় আন্দোলন চলিয়াছে এবং অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকে একীভূত করিয়া বুঝিতেছেন; এই জন্য এই দুইটি বিষয় বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে।

চির-সেব্য ধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কার্য্য এক ভাবে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার একাকার হইয়া মহান্ অনর্থ উপস্থিত করিবে। সমাজ-সংস্কার ও সভ্যতা-বর্দ্ধন যদি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল সংস্কৃত ও সভ্য সমাজেরই ধর্ম্ম হইয়া থাকিবে। বিশ্বজনীন, আধ্যাত্মিক ও উদারতর বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট হানি করা হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য-সেব্য; যেমন প্রতিদিন অন্ন-পান গ্রহণ করিতে হইবে, সেই রূপ প্রতিক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিপালন করিতে হইবে। সমাজ-সংস্কারের ভার এ রূপ নহে; যখন যে বিষয়ে যত দূর সংস্কার করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে, তখন তত দূর পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিতে হইবে। কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি সভ্য কি বর্ব্বর, ধর্ম্ম সকলেরই আশ্রয় ভূমি ও আরাম-স্থান; কিন্তু সমাজ-সংস্কারে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সকলেই অগ্রসর হইতে পারে না। সমাজ-সংস্কার ও সভ্যতা বর্দ্ধনের অন্ত নাই; যত দিন বিচিত্র-প্রকৃতি মনুষ্য-কুল পৃথিবীতে সমাজ-বদ্ধ হইয়া থাকিবে, ততদিন প্রতিদিনই সমাজ-সংস্কার ও সভ্যতার নূতন নূতন কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা, সত্য-নিষ্ঠা, ন্যায়-ব্যবহার, আত্মসংযম প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গ সমুদায় দেশ কাল ও অবস্থার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নিরন্তর প্রতিপালন করিতেই হইবে। ধর্ম্ম সকল কার্য্যেরই নিয়ামক; সমুদায়ই ধর্ম্মের অধীন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কিন্তু ধর্ম্ম সমাজেরও অধীন নহে, রাজনীতিরও দাস নহে এবং কৃষি বাণিজ্যেরও মুখাপেক্ষী নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম একেশ্বর-প্রতিপাদক, অপৌত্তলিক ধর্ম্ম; যাঁহারা বিশ্বাস ও কার্য্যে এক মাত্র ঈশ্বরকে অঙ্গীকার করিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহারদিগেরই নিজস্ব। সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্য লইয়া ব্রাহ্মেরা যদি আপনার রুচি অনুসারে ধর্ম্মের অবিরোধে সহস্র মতে বিভক্ত হইয়া যান, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইবে। যে সকল বিধবা পরলোকবাসী পতির প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ নিবন্ধন আত্ম-সংযম পূর্ব্বক চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে, আর যাহারা দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণ করিয়া পুনরায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে; ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয়েরই অবলম্বন হইবেন। যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষ চিরজীবন

অনূঢাবস্থায় অবস্থান করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারদিগের নিমিত্তও মুক্তদ্বার থাকিবেন। নিজ বর্ণেই অবস্থান কর, আর বর্ণান্তরের সহিত সংকীর্ণ হইয়া যাও; ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয়েরই আশ্রয় হইবেন। ফলত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই আহ্বান করিতেছেন এবং সকলেরই আরামস্থান ও শান্তিনিকেতন হইয়া আছেন।

সমাজ-সংস্কার ও সভ্যতা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া কখনই পরিগৃহীত হইতে পারে না; কিন্তু আমারদের এরূপ বলিবার বিলক্ষণ অধিকার আছে যে ব্রাহ্মেরা ব্যতীত সমাজ সংস্কারে ও সভ্যতা বর্দ্ধনে আর কে অগ্রসর হইবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতির সমুদায় প্রতিবন্ধক দূরীকৃত করিতেছে। ব্রাহ্মেরা যেমন ধর্ম্ম বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন; সেই রূপ এক্ষণে আপনার আপনার সামর্থ্য, অবস্থা ও অভিরুচি অনুসারে উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশুদ্ধ আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে সকল দেশের অগ্রগণ্য হইয়া মাতৃ-ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে থাকুন। এ সকল বিষয়ে ব্রাহ্ম ব্যতিরেকে আমরা আর কাহার মুখ চাহিয়া থাকিতে পারি?

ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুকরণ করিয়া সাধ্যানুসারে সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর হন; যে সকল ভয়ানক দোষে জন-সমাজ আকুলীভূত হইয়া আছে, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দূরীকৃত করেন; পরস্পরের স্বাধীনতা ও সুখ স্বচ্ছন্দতার অব্যাঘাতে সামাজিক নিয়ম-সকল পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত ও সংস্থাপিত করেন; ইহা ধন জন বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি বহুবিধ উপকরণ-সাপেক্ষ হইলেও নিতান্ত প্রার্থনীয়, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

থিওডোর পার্কর।

২৭১ সংখ্যক পত্রিকার ১৫০ পৃষ্ঠার পর।

যদি আমরা মনুষ্য জাতির ধর্ম্ম সংক্রান্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে মনুষ্যের সভ্যতার তিন প্রকার অবস্থায় উপাসনার তিনটি মত প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথম জড়োপাসনার মত, দ্বিতীয় পুরুষোপাসনার মত, তৃতীয় একেশ্বরোপাসনার মত। যদি স্থির চিত্তে অনুধ্যান করা যায়, তাহা হইলে এই তিন শ্রেণীকেই বাহ্য ও অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু আপাতত আমাদিগের এই প্রস্তাবের বিশেষ উপযোগী বলিয়া উহা ঐ রূপেই কল্পিত হইল। এই তিন প্রকার উপাসনা প্রত্যেক জাতিতে প্রায় দৃষ্ট হয়। এক প্রণালী যে স্বতন্ত্র একটি জাতিকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা নহে। দেখ খৃষ্ট পৌত্তলিক জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও এক মাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক হইয়া ছিলেন। আবার এমনও অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুসারী অপৌত্তলিক জাতির মধ্যে সঞ্জাত ও প্রতিপালিত হইয়াও বহু সংখ্য দেবতার উপাসক হইয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহার যে রূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাহার ধর্ম্মও তদনুরূপ উন্নত হয়।

যে ধর্ম্ম-প্রভাবে পশু পক্ষী প্রভৃতি অতি প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভৌতিক পদার্থ সমুদায়ের উপাসনা করা যায়, তাহাকে জড়োপাসনা বলে। এই জড়োপাসনার নানা প্রকার বিধি ও প্রণালী আছে। তৎসমুদায় অতি প্রাচীন কালের ন্যায় এক্ষণেও অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। যখন মনুষ্য-সমাজ কএক পদ মাত্র উন্নতি

পৃথিবীতে আরোহণ করে, যখন সভ্যতার অত্যল্পই উন্মেষ হয়, যখন সামাজিক আচার ব্যবহার নিতান্ত বন্য ও যৎসামান্য থাকে, যখন মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি কারণ অনুধাবন না করিয়া কার্য্য করে, যখন মনুষ্য প্রকৃতি ও আপনাকে জানিতে না পারে, তখনই এই জড়োপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। কোন কোন মহাত্মা কহিয়া থাকেন যে, মনুষ্যের ভ্রম জ্ঞানের পূর্ব্বে প্রমা জ্ঞান জন্মে; সুতরাং তাহারা সর্ব্বাগ্রেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও এক মাত্র তাঁহারই উপাসনা করে। মনুষ্যের ভাব মনুষ্যকে স্বভাবতই এক ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। যদি ভাবের কার্য্য গুলি সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে এই প্রকার অনুমান সঙ্গত, সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন মনুষ্যের অসভ্যতার সহিত অনভিজ্ঞতার একান্ত প্রাদুর্ভাব থাকে, তখন ভাবের প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য কদাচই অনুষ্ঠিত হয় না, সুতরাং তৎকালে ধর্ম্মভাব আপনার বিষয় ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়।

এই ধর্ম্মে পশুপক্ষী মৃৎ পাষাণ প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ-সমুদায় দেবতা বোধে উপাসিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত উপাস্য পদার্থ পশু পক্ষী ও মৃৎ পাষাণ রূপে পরিগণিত না হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়াই পরিকল্পিত হয়। জড়োপাসকেরা কহিয়া থাকেন যে, প্রকৃতি ঈশ্বরের ছায়া; ঈশ্বর স্বয়ং প্রকৃতিরূপ ছদ্মমুখে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং এস্থলে স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদায় স্বরূপ-বুদ্ধিতে কদাচই উপাসিত হইতেছে না। দেখ, ইজিপট্ দেশীয়েরা কুম্ভীরের উপাসনা করিয়া থাকে। উহারা কহে যে, এই জন্তু ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিরূপ; অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ইহার জিহ্বা নাই এবং ঈশ্বরও আপনার মহিমা ও শক্তি স্বমুখে ব্যক্ত করিতে চাহেন না। এই রূপ যে জাতি যে কোন জন্তুর আরাধনা করে, সেই জন্তুর এই প্রকার এক একটি অসামান্য গুণের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। কোন জন্তুর বাত্যা প্রভৃতি কএকটি প্রাকৃতিক ঘটনা উপস্থিত হইবার স্বাভাবিক পূর্ব্বজ্ঞান, কোন জন্তুর অসম্ভব বশ্যতা, কোন জন্তুর আন্তরিক ভাবের অনববোধ, এই সমস্ত গুণ উহাদিগকে মনুষ্যের অতীত শক্তিতে ব্যবস্থাপিত করিয়া দিতেছে। এই সমস্ত গুণের সম্ভাবই উহাদিগকে আরাধ্য করিয়াছে। এই সম্প্রদায় সামান্য পদার্থে সেই অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি ঈশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু যে মনুষ্যজাতির জ্ঞান ও শক্তি অবগত হওয়া যাইতেছে, এ অবস্থায় সে কদাচই উপাসনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

এই কাল্পনিক ধর্ম্ম প্রকৃত সত্য ধর্ম্মের শৈশবাবস্থা। এস্থলে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় পোষিত হইতেছে। বাহ্য-জ্ঞান চিন্তার উপরে আধিপত্য করিতেছে এবং প্রকৃতিতে ঈশ্বরত্ব আরোপিত হইতেছে। সমস্ত প্রকৃতিই ঈশ্বর। এই ধর্ম্মের প্রভাবে পূর্ণতা অপূর্ণতায় নিহিত এবং স্রষ্টা অপেক্ষা সৃষ্ট পদার্থই পূজিত হইতেছে। এই ধর্ম্মের আবার উচ্চ ও নীচ এই দুইটি প্রণালী আছে। পশুপক্ষীর আরাধনা ইহার নীচ প্রণালী এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডের আরাধনা উচ্চ প্রণালী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। গ্রিশ দেশীয় পণ্ডিত ও ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা এই উচ্চ প্রণালীর অনুসারে বিশ্বকেই ঈশ্বর বোধ করিয়া আরাধনা করিতেন। তৎকালে তাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র দেখিতেন না। সুতরাং বিশ্বোপা-

সনা ও জড়োপাসনা প্রায় একই প্রকার বলিতে হইবে।

এই সম্প্রদায় মধ্যে প্রত্যেকেরই পশু-পক্ষী চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি এক একটি নির্দ্দিষ্ট দেবতা আছে। এই সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সম্প্রয়ীরা এই রূপ বিবেচনা করে যে, এই সমস্ত উপাস্য পদার্থ মনুষ্যের ন্যায় জীবনসম্পন্ন। এই অবস্থায় পুরোহিত বলিয়া একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সকলেই ইচ্ছানুসারে আপনার ইষ্ট দেবতার সন্নিহিত হইতে পারিত। এক জন মধ্যবর্ত্তী পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রত্যেকে ঐ অভীষ্ট দেবতার উপাসনা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে সমর্থ হইত। উপাসনার কিছুমাত্র নিয়ম ছিল না। উপাসকেরা স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে উপাসনা সম্পন্ন করিত। এই ধর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট কোন একটি অধিকার ও ধর্ম্মসংক্রান্ত মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুমোদিত বিষয় গোপন করিয়া রাখিত।

যত দিন মনুষ্যেরা ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তত দিন এই জড়োপাসনার প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইত। অনন্তর যখন বস্তুগত গুণের প্রত্যাহার ও তাহার ব্যাপ্তি নিরূপণ করিবার শক্তি মনুষ্যের পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যখন বাহ্য প্রকৃতির গুণ উহাদের সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন এক একটি গৃহের এক একটি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। পরে সেই দেবতা এক একটি জাতির দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত দেবতার শক্তি পরিমিত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিত।

এই রূপে যখন পরিবার ও জাতি সাধারণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা কল্পিত হইল, তখন উহাঁদের ইচ্ছা হৃদয়ঙ্গম করাইতে এবং দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধির আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে পুরোহিত আবশ্যক হইল। প্রথমত এই পুরোহিত দিগের এই রূপ ক্ষমতা ছিল যে ইহাঁরা কেবল আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাই প্রদান করিবেন। পরিশেষে ইহাঁরা কত গুলি দেবরহস্য প্রস্তুত করিলেন। দেবগণকে সাধারণ-জ্ঞানের অবিষয়ীভুত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। কত গুলি মত, বিধি ও প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উপাসকদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশ তাঁহাদিগের রাজ্য শাসন শক্তি অধিকার করিবার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া একটি ঐশ্বরিক রাজত্ব সংস্থাপন করিলেন। নিকৃষ্ট অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্ব আধিপত্য করিতে লাগিল। এই রূপ পৌরোহিত্য রীতি সর্ব্বাগ্রে আরব্ধ হইয়া বহু কাল চলিয়া আসিয়াছিল। এক্ষণেও যে জাতি সভ্যতার সুনির্ম্মল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই জাতি মধ্যেও এই পৌরোহিত্যাধিকার নয়ন গোচর হইয়া থাকে।

দমেন সদৃশং ধর্ম্মং নান্যং লোকেষু শুশ্রুম।
দমোহি পরমোলোকে প্রশস্তঃ সর্ব্বধর্ম্মিণাং॥
সুখং দান্তঃ প্রস্বপিতি সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
দমস্তেজোবর্দ্ধয়তি পবিত্রঞ্চ দমঃ পরং॥
অদান্তঃ পুরুষঃ ক্লেশং অভীক্ষ্ণং প্রতিপদ্যতে।
অনর্থাংশ্চ বহূনন্যান প্রসৃজত্যাত্মদোষজান্॥
সত্যং সৎসু সদা ধর্ম্মঃ সত্যং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরমা গতিঃ॥
সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যং অবিকারি তথৈবচ।
সর্ব্বধর্ম্মাবিরুদ্ধেন যোগেনৈতদবাপ্যতে॥

মহাভারত শান্তি পর্ব্ব।

বিজ্ঞান
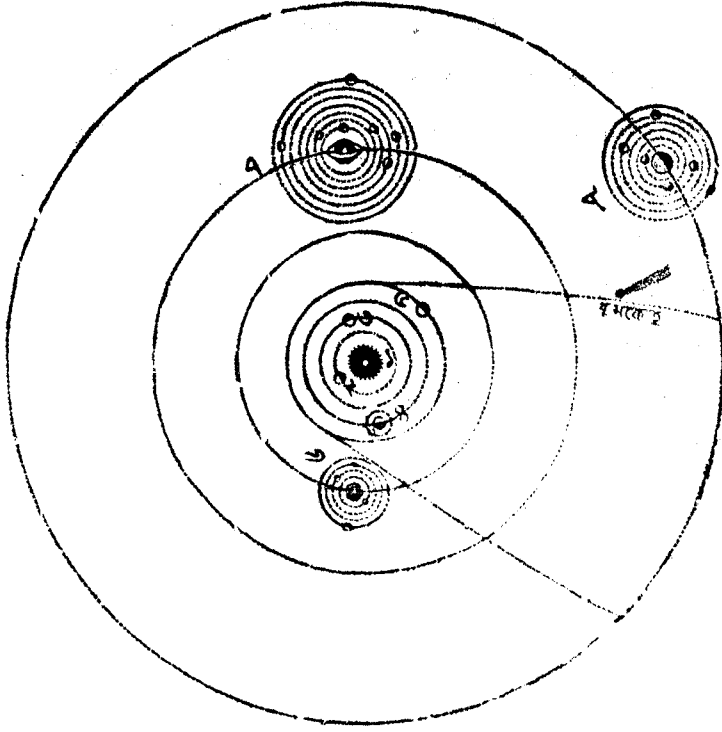
আমরা রজনীতে নভোমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই যে, নির্ম্মল নীলবর্ণ অতি বিস্তীর্ণ শূন্যময় প্রদেশে হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায় অবিরল ভাবে লম্বিত রহিয়াছে। এই সমস্ত দেখিবামাত্র বিস্ময়াবেশে অতিমাত্র অভিভূত হইয়া মনোমধ্যে স্বভাবতই এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে যে, যাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে এই সমস্ত অদ্ভুত প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড অসীম আকাশ মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ভ্রাম্যমান হইতেছে, তিনি কি পৃথিবীর ন্যায় ইহাদিগকে মনুষ্য-সদৃশ কোন জীবের বাসোপযোগী করিয়া দিয়াছেন? ঐ সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থে কি এমন সকল জীব বাস করে যাহারা বিবেচনার নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি, স্মরণ করিবার নিমিত্ত স্মৃতি শক্তি এবং দয়া স্নেহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় অধিকার করিতেছে? উহাতে কি উষারাগ ও সন্ধ্যার শোভা পর্য্যায়ক্রমে জীবগণের নয়ন মন অপহরণ করে? ঐ সমস্ত স্থানে জলদজাল যথাকালে উদিত হইয়া কি উদ্ভিজ্জ রাজ্যের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে?

মনুষ্য এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দূরবীক্ষণের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা অতি দূরতর পদার্থ অপেক্ষাকৃত সমক্ষে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার বিষয় অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু দূরবীক্ষণ দ্বারাও এই জ্ঞাতব্য বিষয় সুস্পষ্ট কাহারই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। মনে কর, একটি পদার্থ সহস্র ক্রোশ উর্দ্ধে দৃষ্টি গোচর হইতেছে কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে তাহাকে যেন দুই ক্রোশ ব্যবধানে আনয়ন করা গেল। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, যে বস্তু দুই ক্রোশ অন্তরে আছে আমরা কি তাহার বিষয় সুস্পষ্ট কিছু জানিতে পারি। কখনই নহে। সুতরাং এই বিষয়ের যতদূর জ্ঞাত হওয়া যায়, বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাদিগের অ-

ভ্রান্ত অনুমানই তাহার কারণ। এই পরি-দৃশ্যমান পৃথিবীর ভৌতিক নিয়ম-সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাকে যেমন জীব জন্তুর বাসোপযোগী বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই রূপ দূরস্থ গ্রহ ও উপগ্রহ সমূহের সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ, গতি, ভৌতিক প্রকৃতি ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া উল্লিখিত বিষয়ের এক প্রকার মীমাংসা করা যায়।

এক্ষণে বিজ্ঞানের সাহায্যে যতগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহকে আমরা রঙ্গস্থলে আনয়ন করিলাম। এই তিনটি গ্রহ পৃথিবীর সহিত নিরন্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং ইহারা অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা সূর্য্যের সন্নিহিত। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এই তিন গ্রহের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিশেষে অন্যান্য গ্রহের বিষয়ও বিবৃত করিব।

সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর এই অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তুগণের বাসোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাতে যে রূপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া দিয়াছেন মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তুর প্রকৃতির সহিত তৎসমুদায়ের বিলক্ষণ একটি সামঞ্জস্যও রাখিয়াছেন। দেখ, আমাদিগের দেহের কত অভাব; কখন ক্ষুধা কখন তৃষ্ণা উপস্থিত হইতেছে এবং বাহ্য জগতে সেই ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জলও আছে। যদি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনই দুর্ব্বহ শরীর ভার ধারণ করিতে পারিতাম না। আবার যদি পৃথিবীর এই আকর্ষণী শক্তি প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে আমরা কখনই দ্রুত-পদে গমন করিতে পারিতাম না; কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগের স্বৈর গমনের সুবিধা বিধানের নিমিত্ত পৃথিবীর এই শক্তিকে পরিমিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা নানা প্রকার কার্য্য বশতঃ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইতেছি; কিন্তু বাহ্য জগতে পর্য্যায়ক্রমে দিবস ও রজনী উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন এক রূপ ঋতু রাজত্ব করিলে মনুষ্যাদি জীব জন্তু ও তরু লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সমূহের জীবিত থাকা নিতান্ত অসম্ভব হইত; কিন্তু সময়ে সময়ে ঋতু পরিবর্ত্ত হইয়া সেই অনিষ্ট নিবারিত হইতেছে। আমরা আমাদিগের এই রূপ প্রকৃতি ও জগতের এই রূপ ভাব দেখিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে মুক্তকণ্ঠে কি স্বীকার করিতে পারি না যে এই পৃথিবী আমাদিগেরই বাসার্থ সৃষ্ট হইয়াছে?

এক্ষণে এই একটি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে যে, যে সকল গ্রহ নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিতেছে, যদি তাহাদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি পৃথিবীর অনুরূপ হয়; যদি ঐ সমস্ত স্থানে নিয়ত কাল বায়ুর সঞ্চার থাকে; সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ নিয়মিত রূপে নিপতিত হয়, যদি তথায় দিবস ও রজনী পর্য্যায় ক্রমে গমনাগমন করে ও ঋতু পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে ঐ সকল দূরতর প্রদেশও মনুষ্যের ন্যায় কোন জীবের বাসভূমি হইবে? যদি আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান কোন প্রমাণই না পাই, তাহা হইলে আমাদিগের অন্তর হইতে এই বিশ্বাস অবশ্যই উৎপন্ন হইবে যে, যিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহা হইতেই ঐ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র নিঃসৃত হইয়া এই অসীম নিরালম্ব প্রদেশে লম্বমান হইতেছে। যখন তিনি এক বিন্দু জলবিম্বকে সহস্র সহস্র জীবের আবাসস্থান করিয়া দিয়াছেন, তখন

ঐ সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থকে জীব-শূন্য করিয়াছেন ইহা কখনই বোধ হয় না।

পূর্ব্বে যে বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের উল্লেখ করা গিয়াছে, তৎসমুদায়েকি প্রকার প্রাকৃতিক গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এই তিনটি গ্রহ পৃথিবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিয়তকাল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের আকার গোল এবং ইহাদিগের পরিমাণ-ফল প্রায় একই রূপ। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সূর্য্য হইতে ইহাদের পরস্পরের অন্তর অতিশয় বিস্ময়কর। বুধ গ্রহ অপেক্ষাকৃত সূর্য্যের সন্নিকৃষ্ট। ইহা সূর্য্য হইতে প্রায় ৩৬০০০,০০০ মাইল অন্তরে আছে। শুক্র গ্রহ সূর্য্য হইতে ৬৮০০০,০০০ মাইল এবং মঙ্গল গ্রহ প্রায় ২৫০,০০০,০০০ মাইল অন্তর। পৃথিবী সূর্য্যের ৯৫০০০,০০০ মাইল অন্তরে থাকিয়া উহা হইতে যে রূপ উপকার প্রাপ্ত হইতেছে, উল্লিখিত তিনটি গ্রহ তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। ভূলোক-সদৃশ অন্য পঞ্চপঞ্চাশ গ্রহ ও উপগ্রহ এই বিশাল সূর্য্য লোকের চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ডবেগে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু করুণাময় জগদীশ্বর ইহাদের প্রত্যেকেরই এমনি প্রাকৃতিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, সূর্য্য হইতে যতটুকু উপকার আবশ্যক, ইহারা অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত ও দূরস্থ হইয়াও তাহাই প্রাপ্ত হইতেছে।

আমরা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, আলোক ও উত্তাপ এই দুই বস্তু উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তুর বিশেষ উপযোগী; এমন কি, আলোক ও উত্তাপ যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহার অভাব উপস্থিত হইলে স্থাবর-ও জঙ্গম কোন ভৌতিক পদার্থই শরীর ধারণ করিয়া থাকিতে পারে না। যেস্থানে কেবল শীত বা কেবল উত্তাপের প্রাদুর্ভাব, সে স্থান উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তুর একান্ত অনুপযোগী। শীত ও উত্তাপ এই দুই পদার্থের যথোচিত সামঞ্জস্য না থাকিলে উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তু ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। উত্তাপের যেমন আবশ্যকতা আলোকেরও আবার সেইরূপ উপযোগিতা আছে। যে পরিমাণে আলোক আবশ্যক, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে দর্শনেন্দ্রিয় কোনক্রমেই আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারে না। কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা, কি অদ্ভুত শক্তি! তিনি এই বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে কেমন কৌশলে আলোক ও উত্তাপ পরিমিত রূপে পরিবেশন করিতেছেন।

এক্ষণে কি উপায়ে আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্তির ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। মনে কর একস্থলে একটি অগ্নিকুণ্ড আছে। এক্ষণে আমি কিরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহা হইতে একই প্রকারে আলোক ও উত্তাপ গ্রহণ করিব। আমি যদি সমসূত্রপাতে ঐ অগ্নির নিকট দিয়া গমন করি, তাহা হইলে যতক্ষণ তাহার নিকটে থাকিলাম, তদবধিই আলোক ও উত্তাপ লাভের সুবিধা হইল; কিন্তু সেই অগ্নি হইতে একটু অন্তর হইলেই তদ্বিষয়ে এককালে বঞ্চিত হইলাম। কিন্তু যদি সমসূত্রপাতে না গিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করি, তাহা হইলে যতক্ষণ ইচ্ছা আলোক ও উত্তাপ একই প্রকারে লাভ করিতে পারি। প্রদক্ষিণ করিতে হইলে মধ্যবিন্দু হইতে অন্তরটি একই রূপ থাকিবে; সুতরাং মধ্যবিন্দু হইতে যাহা লাভ করিতে হইবে, তাহা একই প্রকারে উপলব্ধ হইবে। তাহার ন্যূনাতিরেক কদাচই উপস্থিত হইবে না। গ্রহ সকল সূর্য্য হইতে যে আলোক

ও উত্তাপ লাভ করিতেছে, তাহাও এই নিয়মের অধীন। উহারা আলোক ও উত্তাপের উৎস সূর্য্যকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে। এই উপায় দ্বারাই উহারা আলোক ও উত্তাপ একই প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই একটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, সকল গ্রহ সূর্য্যের সমান্তরালে নাই। কোনটা নিকট কোনটা বা অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী; সুতরাং নিকটস্থ গ্রহ যে পরিমাণে সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ লাভ করিবে, দূরস্থ গ্রহটি সেই পরিমাণে কদাচই তাহা পারিবে না। সুতরাং যদি আলোক ও উত্তাপ উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুগণের দেহধারণের একান্ত উপযোগী হয়, তাহা হইলে যে সমস্ত গ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া আলোক ও উত্তাপ পরিমিত রূপ প্রাপ্ত হইতেছে, তৎসমুদায়েই জীবজন্তুর বাস সম্ভবপর হয় এবং যাহাতে আলোক ও উত্তাপের অভাব আছে, তথায় উহাদের বাস একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে।

আমরা এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই যে, গ্রহগণের দূরতা বা নৈকট্য সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্তির প্রকৃত উপায় নহে। এই পৃথিবীতে যে উপায়ে উত্তাপ পাওয়া যায়, অগ্রে তাহাই নির্দ্ধারণ আবশ্যক, তাহা হইলে অন্যান্য গ্রহের বিষয়ও বিশদ হইয়া যাইবে। আমাদিগের এই অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত রহিয়াছে। আমরা এই স্থানে যে, সূর্য্য হইতে উত্তাপ প্রাপ্ত হই, অত্রত্য বায়ুর ঘনত্বই তাহার কারণ। বায়ু যে পরিমাণে ঘন হইবে, উত্তাপও সেই পরিমাণে উপলব্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নদেশে যেরূপ উত্তাপ প্রাপ্ত হই, একটি পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিলে আর সেই প্রকার পাই না। কারণ নিম্নে যেমন বায়ুর ঘনত্ব আছে, ঊর্দ্ধে সে রূপ নাই। বায়ু তরল হইলে তাহার উত্তাপ আকর্ষণ ও রক্ষণের ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং যদি গ্রহ-সমূহ বায়ুমণ্ডলে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহা হইলে উহারা সূর্য্য হইতে দূরে বা নিকটেই থাকুক অবশ্যই উত্তাপ প্রাপ্ত হইবে। যে গ্রহটি সূর্য্যের নিকট, তাহার শীতোত্তাপমান যেমন হইবে, দূরস্থ গ্রহের তদপেক্ষা কখনই অল্প হইবে না। দেখ যে স্থান দিয়া সূর্য্য গমনাগমন করে, সেই অয়নবৃত্তে যে সমস্ত উন্নত পর্ব্বত আছে, তাহাদের শিখরদেশে কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী অক্ষাংশের ন্যায় শীতের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে দূরত্ব ও নৈকট্য উত্তাপ প্রাপ্তির প্রকৃত কারণ নহে। ইহার অন্যথা হইলে অয়নবৃত্তস্থ পর্ব্বতের উপরিভাগে শীতোত্তাপমান অবশ্যই অন্য প্রকার হইত।

এক্ষণে কি প্রকারে সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও বিবেচিত হইতেছে। যে গ্রহ হইতে সূর্য্যের আকার যে পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তথায় সেই আকারের অনুরূপ আলোক লাভ হইয়া থাকে। বুধ গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, উহাতে যে পরিমাণে সূর্য্যের আকার দেখা যাইবে, তাহার অপেক্ষা শুক্র গ্রহে, শুক্র গ্রহ অপেক্ষা পৃথিবীতে এবং পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল গ্রহে উহার আকার আরও ক্ষুদ্র বোধ হইবে। সুতরাং বুধ-গ্রহে সূর্য্যের আলোক যে পরিমাণে নিপতিত হয়, শুক্রে তাহার অপেক্ষা অল্প হইবে এবং শুক্র অপেক্ষা পৃথিবীতে ও পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গলে আরও অল্প হইবে।

আমরা দেখিতেছি যে, আলোকের অল্পতা বা আধিক্য হইলে আমাদিগের দর্শন